www.draminlibrary.com

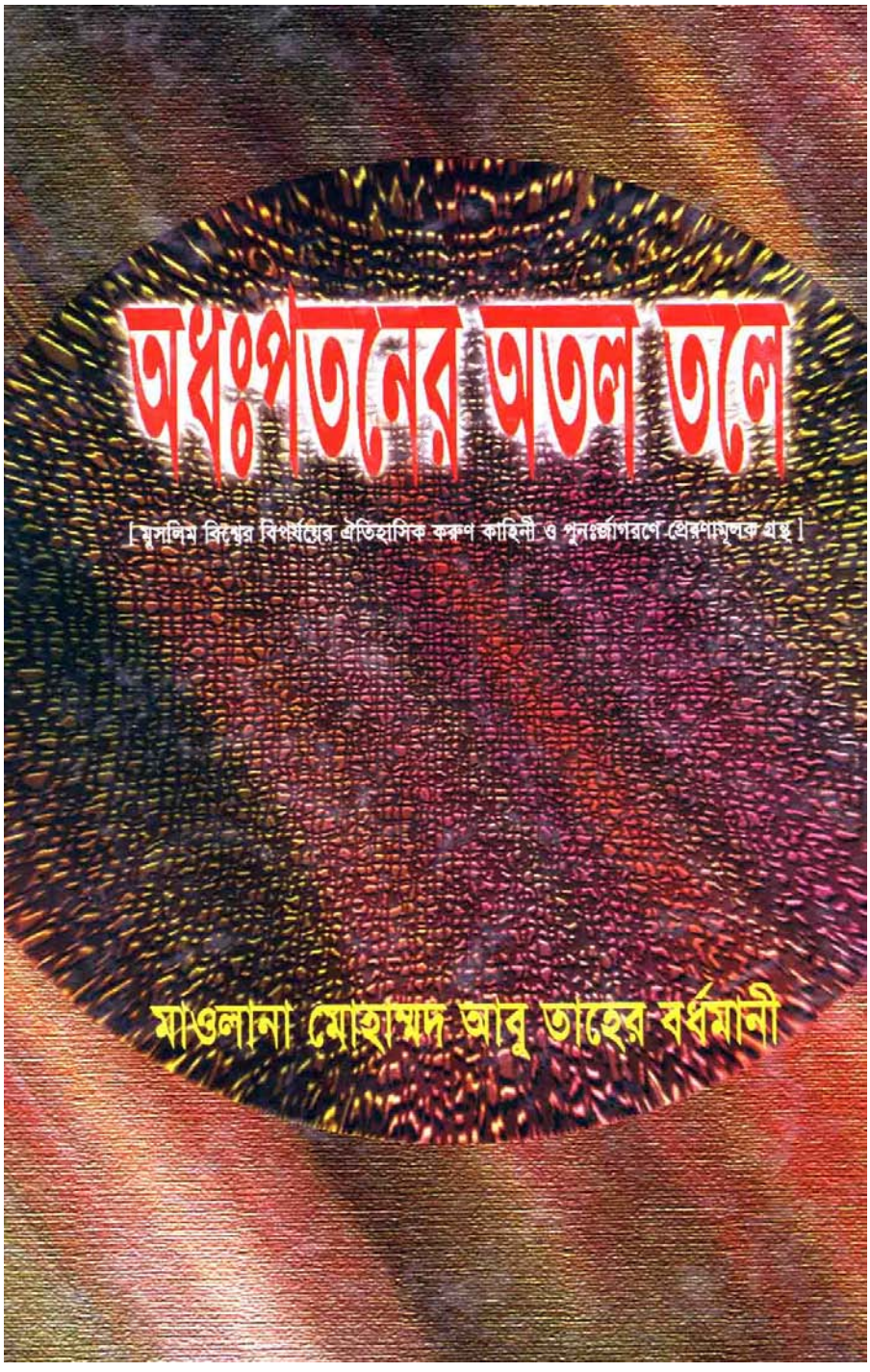

www.draminlibrary.com

অধঃপতনের অতল তলে

মাওলানা মোহাম্মদ আবু তাহের বর্ধমানী

"শক্তি-সিন্ধু মাঝে রহি হায়
শক্তি পেলোনা যে
মরিবার বহু পূর্বে জানিও
মরিয়া গিয়াছে সে।"

– নজরুল

আল-ইসলাম রিসার্চ সেন্টার

www.draminlibrary.com

প্রকাশনায় ঃ
আল-ইসলামে রিসার্চে সেন্টার
(আহলে হাদীস লাইব্রেরী ঢাকা 'র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
২২১, বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০,
ফোন ঃ ৯৫৫৭১৭২

তৃতীয় প্রকাশ ঃ
জমাদিউল আউয়াল ১৪২২ হিজরী
আগস্ট ২০০১ ঈসায়ী
শ্রাবণ ১৪০৮ বাংলা

কম্পিউটার কম্পোজ ও
প্রচ্ছদ ডিজাইন ঃ
তাওহীদ কম্পিউটার্স এন্ড পাবলিশার্স
৯০, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল,
ঢাকা-১১০০, ফোন ঃ ৭১১২৭৬২

মূল্য ঃ ৪০/= টাকা মাত্র

www.draminlibrary.com

শুকরিয়া

আয়নার পারদ আয়না থেকে খসে পড়লে আয়নার যে অবস্থা হয়, মুসলমানদের ঠিক সেই অবস্থাই হয়েছে। তাই আমি 'অধঃপতনের অতল তলে' লিখে প্রকাশ করলাম। এই পুস্তক প্রকাশ করতে আমি যাঁদের কাছ থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি তাঁরা হচ্ছেন ঃ দিনাজপুরের খ্যাতনামা আইনজীবী শ্রদ্ধেয়–এডভোকেট নজিবর রহমান, শ্রদ্ধেয় আলহাজ্জ জমিরুদ্দীন আহমদ, শ্রদ্ধেয় আলহাজ্জ জলিলুদ্দীন আহমেদ ও তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বাংলার অন্যতম কন্ট্রাক্টার জনাব মতিউর রহমান ও তাঁর দ্বিতীয় পুত্র নর্দার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপের মালিক জনাব খায়রুল আনাম, আমীর সোপ ফ্যাক্টরীর মালিক জনাব আমীর হোসেন চৌধুরী, গণেশ তলা পেট্রোল পাম্পের মালিক জনাব মতিউর রহমান, রিজিয়া সোপ ফ্যাক্টরীর মালিক জনাব মনসুর আলী, ইলেক্ট্রিক ব্যবসায়ী জনাব খন্দকার ফখরুজ্জামান, হাজী মশিরুদ্দীন আঃ ও রাজশাহীর বানেশ্বর বাজারের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী জনাব আবু বকর সিদ্দিক। সেই সঙ্গে স্মরণ করি মুকুল প্রেসের স্বত্বাধিকারী বন্ধবর তাহেরুদ্দীন আহমদকে। কারণ পুস্তক প্রকাশের ব্যাপারে তিনি আমাকে যথেষ্ট সুযোগ সুবিধে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে আরও শুকরিয়া আদা করি সেই মহান ব্যক্তির যিনি এই পুস্তকের ভূমিকা লিখেছেন, তিনি হচ্ছেন সর্বজনমান্য, দিনাজপুর 'ল' কলেজের প্রিন্সিপাল, প্রাক্তন মন্ত্রী, এডভোকেট হাসান আলী এম, এ, বি, এল সাহেব।

প্রার্থনা করি দয়ার-দরিয়া-দরবারে ইলাহির হুজুরে তিনি যেন এঁদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করেন এবং অশেষ নেকী দান করেন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

কৃতজ্ঞ

মোঃ আবু তাহের বর্ধমানী

www.draminlibrary.com

ভূমিকা

"নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রসূলিহীল কারীম"

সুবিখ্যাত আলেম, বাগ্মী ও লেখক বন্ধুবর মাওলানা মোঃ আবু তাহের বর্ধমানী সাহেবের সম্প্রতি লিখিত 'অধঃপতনের অতল তলে' নামক পুস্তিকাখানা আমার হস্তগত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিলাম মাওলানা সাহেব বর্তমান মুসলমান জাতির চরম অধঃপতনের জন্য নিদারুণ মর্ম-কাতর-মন লইয়াই এই পুস্তিকা লিখিয়াছেন। আমার মত এক নগণ্য গোনাহ্‌গার মুসলমানও অনুরূপ ব্যথার সঙ্গী হইয়াছি।

মুসলমান জাতি যে অধঃপতন ও নিকৃষ্টতার চরম পর্যায়ে উপস্থিত হইয়াছে তাহা আজ এমনই জাজ্বল্যমান পরিদৃষ্ট হইতেছে যে ইহার প্রমাণের জন্য 'লর্ড বার্নাডশ' এর সাক্ষ্যের কোন প্রয়োজন করে না।

দেশের সর্বত্র যে অশান্তি বিরাজ করিতেছে তজ্জন্য শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী-গরীব, পণ্ডিত-মূর্খ –সকলের মুখে শুনিতে পাইতেছি আমাদের ঈমান নাই, আমাদের ধর্ম নাই–তাই আমরা এই ভীষণ অশান্তির দাবানলে পুড়িয়া মরিতেছি।

মাওলানা সাহেবও তাঁহার দীর্ঘ নিবন্ধে এই কথাই নিতান্ত দুঃখ-কাতর লেখনীর মুখে প্রকাশ করিয়াছেন। এই হীনতা ও দীনতার কারণ কি? মাওলানা সাহেব তাঁহার প্রবন্ধের শিরোভাগে উত্তর দিয়াছেন–"আমরা আমলের দোষে কলংকিত।

ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে, মহানবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার (সঃ) আবির্ভাবের প্রাক্কালে সারা পৃথিবীতে মানবজাতির অবস্থা কি হইয়াছিল, তিন চার হাজার বৎসর ধরিয়া যে মানব সভ্যতা অর্জিত হইয়াছিল তাহা ধ্বংসের মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। বিশ্বের মানব সমাজ তখন পুনর্জীবন প্রাপ্তির জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে করুণ প্রার্থনা জানাইতেছিল–করুণাময় তুমি মানব জাতিকে রক্ষা কর। এক কথায় সভ্যতার বিরাট বৃক্ষ যখন পাপ ও অনাচারের ভয়াবহ

www.draminlibrary.com

ঝঞ্ঝা-প্রবাহে উৎপাটিত হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইতেছিল সেই সময় করুণাময় আল্লাহ তা'আলা মহানবী (সঃ)-কে এই দুনিয়ায় পাঠাইয়াছিলেন এবং আমরা দেখিতে পাই মহানবীর (সঃ) অন্তর্ধানের মাত্র এক শতাব্দীর মধ্যে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যে ইসলামের সত্য ও সুমহান আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইল এবং মানবীয় সভ্যতার প্রদীপ্ত সূর্য্য পুনরায় বিশ্বজগতে উদিত হইল। পুনরায় বিশ্বজগতে ধর্ম ও জ্ঞানের আদর্শ ও ন্যায়-বিচারের বিরাট জ্যোতি-সৌধ সংস্থাপিত হইল। ধর্মে, রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, শৌর্য্যে, বীর্যে ও চরিত্র মহিমায় দুনিয়ায় শীর্ষস্থান অধিকার করিল। আর আজ আমরা নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতর জীবে পরিণত হইয়াছি। হায় আফসোস! শত আফসোস। এ অবস্থা আমাদের সত্য-আকিদা, বিশ্বাস, চিন্তাধারা ও আদর্শের বিবর্তন ও হীন কর্ম্ম ও আমলের অবশ্যম্ভাবী প্রতিফলনরূপে প্রকাশমান। আজ আমরা ইসলামের মহাজ্যোতি পরিত্যাগ করিয়া ঈমান ও আমলের সুন্দর সুদৃঢ় শক্তিসৌধ পরিত্যাগ করিয়া গায়ের ইসলামের বাহ্যতঃ চাকচিক্যময় তথা পুতিগন্ধময় সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠে আশ্রয় লইতেছি। ইসলামের সত্য-সুন্দর কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'কে বিস্মৃত হইতে চলিয়াছি। আমাদের স্বকীয় নিশ্চিত সত্য সুমহান জীবনাদর্শ ধ্যানধারণা ও কর্মপ্রণালী পরিত্যাগ করিয়া জড়বাদী ইহকাল-সর্বস্ব ও পরকালে অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের গোলাম হইয়া পড়িতেছি–অসভ্যতাকে সভ্যতা বলিয়া মানিয়া লইয়াছি, অধর্মকে ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিতেছি; অবিশ্বাসী ও অংশীবাদীদের অমূলক ও মিথ্যা জ্ঞান-গরিমার মোহে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি এবং নিশ্চিত বিনাশ ও ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতেছি।

আজ মুসলমান আমরা মহান আল্লাহর শাশ্বত বাণী "কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখ্‌রিজাত লিন্নাসি, তা'মুরুনা বিল্ মা'রুফে ওয়া তান্‌হাওনা আনিল মুনকারে ওয়া তু'মিনুনা বিল্লাহ।" (হে মুসলমান) আমি তোমাদিগকে মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠদল হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছি; তোমাদের কর্তব্য হইতেছে সত্য ও ন্যায়ের শাসনদণ্ড পরিচালনা করা আর অসত্য ও অন্যায় থেকে দেশ ও সমাজকে মুক্ত করা।

www.draminlibrary.com

শ্রদ্ধেয় লেখক বন্ধুবর মাওলানা সাহেব তাই আমাদিগকে বলিয়াছেন–মুসলমান সাবধান। সময় থাকিতে সাবধান হও। আজ তোমাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, যুবক-যুবতী ও ছেলেমেয়ে ইসলামকে বিসর্জ্জন দিয়া শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিদ্যা, জ্ঞানচর্চ্চা ও ভদ্রতার নামে নৃত্য, গান, বাজনা, সিনেমা ও সেমিনারের আকর্ষণে মোহ মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। অবস্থা দেখিয়া মনে হয় দেশের আকাশে অচিরেই চিত্র তারকা সুশোভিত হইয়া এক শাদ্দাদী বেহেশ্‌তে পরিণত হইবে।

জীবন ধ্বংসী এই রোগের প্রতিকার কি? মাওলানা সাহেব ইঙ্গিত দিয়াছেন–এই জাতিকে তওবা এস্তেগ্‌ফার করিয়া পুনরায় তওহীদ ও রিসালাতের, আল্লাহ ও রসূলের, কুরআন ও হাদীসের হুকুম আহকামকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া নতুন উদ্যমে ইসলামী জীবনের আমল ও কর্মধারাকে বিশুদ্ধ করিতে হইবে। যেমন কবি সম্রাট আল্লামা ইকবাল বলিয়াছেন–

"আমলসে জিন্দেগী বানতী হ্যায় জান্নাতভী জাহান্নামভী,
আগার আমল নেহী তো কুছ নেহী না নূরী হ্যায় না না-রী হ্যায়।"

কর্মের দ্বারা জীবন গঠিত হয়। কর্মহীন জীবন নিষ্ফল–বেহেশ্‌তও নয় দোজখও নয়।

শ্রদ্ধেয় মাওলানা বর্ধমানী সাহেবের এই নিবন্ধ উপযুক্ত সময়েই প্রকাশ পাইতেছে। আশা করি দেশের তরুণ ও যুব সম্প্রদায় ইহা পাঠে পরম উপকৃত হইবেন এবং ইসলামী জীবন গঠনের ব্রত অবলম্বন করিয়া জাতির ও সমাজের কল্যাণ সাধনের কার্য্যে অগ্রসর হইবেন। আমীন! আমীন!!

বিনীত
হাসান আলী এম, এ, বি, এল
(এডভোকেট)
প্রিন্সিপাল 'ল' কলেজ দিনাজপুর।
প্রাক্তন মন্ত্রী

দিনাজপুর
০৮-০৯-৭৪ ইং

www.draminlibrary.com

بسم الله الرحمن الرحيم

অধঃপতনের অতল তলে

আমরা আমলের দোষে কলঙ্কিত

একদিন এক ভদ্রলোক 'লর্ড বার্নার্ডশ'কে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বলুনতো স্যার, পৃথিবীর মধ্যে কোন্ ধর্ম শ্রেষ্ঠ? উত্তরে তিনি বললেন, ইসলাম ধর্মই হচ্ছে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

আবার ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বলুনতো স্যার, কোন্ জাতি নিকৃষ্ট? উত্তরে তিনি বললেন, মুসলমান।

লর্ড বার্নার্ডশ' একজন বিখ্যাত লোক। তিনি বিভিন্ন সময়ে ইসলাম, কুরআন, মহানবী মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও স্বর্ণ যুগের মুসলমানদের ভুয়সী প্রশংসা করেছেন। অথচ জনৈক ব্যক্তির প্রশ্নের জওয়াবে তিনি মুসলমান জাতিকে নিকৃষ্ট বলে অভিহিত করলেন কেন?

ইতিহাসের ছাত্র মাত্রই জানেন যে, জ্ঞানে, গরিমায়, শিক্ষায়, সভ্যতায়, ইবাদতে, উপাসনায়, রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, কাব্যে, সাহিত্যে, শিল্পে, বাণিজ্যে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, ধর্মে, কর্মে, ত্যাগে, তিতিক্ষায়, মহানুভবতায়, পরোপকারিতায় শৌর্য্যে, বীর্যে ও চরিত্র মাধুর্য্যে মুসলমান জাতিই দুনিয়ার শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। প্রিয় নবীর পর মাত্র এক শতাব্দীর মধ্যে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যে তারা ইসলামের সুমহান আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিল। মদিনা, কুফা, বস্‌রা, দামেশ্‌ক, বাগদাদ্, কর্ডোভা, সেভিল, গ্রানাডা, সমরখন্দ ও ইস্পাহান শহরগুলিকে ব্যবসা, বাণিজ্য, পার্থিব সম্পদ, আর শিক্ষা, সভ্যতা, তাহ্‌যিব ও তামাদ্দুনের কেন্দ্রস্থলে তারা পরিণত করেছিল। বিভিন্ন

www.draminlibrary.com

দেশ হতে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী, লক্ষ লক্ষ জ্ঞান-পিপাসু, লক্ষ লক্ষ জ্ঞানের সন্ধানী উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য মুসলমানদের কাছেই ছুটে যেতো। এ ব্যাপারে সারা দুনিয়া যে মুসলমানদের কাছে ঋণী তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

সুবিখ্যাত মুসলিম পণ্ডিত 'আল্‌কিন্দি' দর্শন শাস্ত্রের গোড়াপত্তন করেছিলেন। তিনি দর্শন, চিকিৎসা, অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, রাজনীতি ও ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে দু'শো পঁয়ষট্টিখানা অতি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এবং বারো শতকের টমাস আকুইনাস পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপের উপর একাধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

মুহাম্মদ ইবনে জাকারিয়া একজন শ্রেষ্ঠ রসায়ন শাস্ত্র বিশারদ ছিলেন। তিনি হীরাকষকে শোধন করে গন্ধব-দ্রাবক তুঁতিয়া প্রস্তুত করেছিলেন। তিনি কৃত্রিম উপায়ে বরফ তৈরি করে সকলকে অবাক করে দিয়েছিলেন। তিনি 'আলকেমী' বিষয়ে কিতাবুল আস্‌রার নামে অতি মূল্যবান একখানা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। মিষ্টার জিরার্ড সাহেব ল্যাটিন ভাষায় এই মূল্যবান গ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন এবং তা রসায়ন শাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে সারা ইউরোপের পাঠ্যপুস্তক ছিল। তিনি দু'শো খানা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। হাম ও বসন্ত রোগ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিজ্ঞান সম্মত আলোচনাপূর্ণ 'আল্‌জুদারী ওয়াল হাস্‌বাহ' নামক গ্রন্থখানা তাঁরই লেখা। ল্যাটিন ও ইউরোপীয় সকল ভাষাতেই এই গ্রন্থের তরজমা প্রকাশ পেয়েছিল। দেখা গেছে শুধু ইংরেজী ভাষাতেই ১৪৯৮ থেকে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চল্লিশবার এই কিতাবের তরজমা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, খৃষ্টজগত হাম ও বসন্ত রোগের বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে চিকিৎসার ব্যাপারে মুসলমানদের কাছেই ঋণী। মুহাম্মদ ইবনু জাকারিয়া দশখণ্ডে সমাপ্ত আর একখানা বিরাট গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তার নাম 'কিতাবুল মনসুরী'। পনর শতকের অষ্টম পদে মিলান শহরে এই গ্রন্থের ল্যাটিন ভাষায় তরজমা প্রকাশিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, পরে এই গ্রন্থের ফারসী জার্মান সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি আরও একখানা বিরাট আভিধানিক গ্রন্থ লিখেছিলেন, যার নাম হলো 'আল হাবী'। এই গ্রন্থে সর্বপ্রকার রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাসহ চিকিৎসার প্রণালী ও ওষুধের ব্যবস্থা ছিল। বলাবাহুল্য, চিকিৎসা বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ অবদান হিসেবে এই কিতাবখানা ইউরোপীয় চিন্তারাজ্যে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল। সিসিলির রাজা প্রথম চার্লস এই সুবৃহৎ গ্রন্থের প্রতি বিশেষ যত্ন নিয়েছিল এবং ষোল শতক পর্যন্ত সারা ইউরোপের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পুস্তকখানি বিশেষ পাঠ্য ছিল।

www.draminlibrary.com

মুসলমানদের কাছে অস্ত্র চিকিৎসার ব্যাপারে সারা ইউরোপ ঋণী। শুধু ইউরোপই নয়, সারা জগতকে আবুল কাসেম আল্ জাহ্‌রী' তাঁর আশ্চর্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। তিনি কর্ডোভার বিখ্যাত হাসপাতালের শ্রেষ্ঠতম অস্ত্র-চিকিৎসা বিশারদ ও প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর চিকিৎসা বিষয়ক বিরাট গ্রন্থ আত্‌তস্‌রীফ বিশ্বের অমূল্য সম্পদ। তাঁর কাছে বিশ্বের দুরারোগ্য রোগীরা আরোগ্য লাভের আশায় ছুটে যেতো। খৃষ্টান, ইহুদী, মিশরী, আরবী, আজমী ও মরক্কোবাসী শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভের আশায় তাঁর বাড়ীতে ভিড় জমাতো। নাকের ছিদ্রে ওষুধ দেওয়ার যন্ত্র, দাঁতের গোড়া পরিষ্কার করার যন্ত্র, দাঁতের গোড়ার গোশত কাটার যন্ত্র, চোখের ছানি অস্ত্র করার যন্ত্র, অন্ধচক্ষু চিকিৎসা করার যন্ত্র, চোখের পলকের গোশত কাটার যন্ত্র, শরীরের যে কোন অংশের বর্ধিত গোশত চেঁছে ফেলার যন্ত্র, তীর বের করার যন্ত্র, মূত্রনালীর পাথর বের করার যন্ত্র, ভাঙ্গা হাড় বের করার যন্ত্র, জরায়ুর মুখ প্রশস্ত করার যন্ত্র, মৃত ভ্রূণকে বের করার দু'রকম যন্ত্র, মৃত ভ্রূণের অঙ্গচ্ছেদ করার যন্ত্র ও সাধারণ চিকিৎসার বহু রকমের যন্ত্র তিনি আবিষ্কার করে দুনিয়ার প্রভুত কল্যাণ সাধন করে গেছেন।

রসায়ন শাস্ত্রের জন্মদাতা হচ্ছে এই মুসলমান। ধাতু সম্পর্কে জাবের ইবনু হাইয়ানের মৌলিক মতামত আঠার শতক পর্যন্ত ইউরোপের রসায়ন শিক্ষায় বিনা দ্বিধায় গৃহীত হতো। পাতন, ঊর্ধ্বপাতন, পরিস্রবণ, দ্রবণ, কেলাসন, ভস্মীকরণ, বাষ্পীকরণ ও গলানো প্রভৃতি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার আবিষ্কার তাঁরই দ্বারা সম্ভব হয়েছিল। তিনি ইস্পাত তৈরির প্রণালী, ধাতুর শোধন প্রণালী, তরল ও বাষ্পীকরণ প্রণালী শিক্ষা দিয়েছিলেন। চুলের নানারকম কলপ্, লোহার মরিচা রোধক বার্নিশ, চামড়ার বার্নিশ, ওয়াটার প্রুফের বার্নিশ, নাইট্রিক এসিড, আর্সেনিক, এন্টিমনি, সিল্‌ভার নাইট্রেড, কিউরিক ক্লোরাইড, পটাস, সোডা, বিভিন্ন রকমের গন্ধক, লিভার অফ সালফার, মিল্ক অফ সালফার, ভিট্রিয়ল, সল্ট আমোনিক, সল্টপিটার ও লেড এসিটেড প্রভৃতির আবিষ্কার তিনিই সর্বপ্রথম করেছিলেন। শুধু জাবের ইবনু হাইয়ানই নন। আল-ফারাবী, ইবনে সিনা, আল-বিরুনী, আল-গাজ্জালী, ইবনে বাজা ও ইবনে রুশদের মত দর্শন, চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ সাধনকারী মুসলিম মনীষীগণ পৃথিবীর অসামান্য প্রতিভা।

মুসলিম মনীষী 'মুসা আল খারেজমী' বহু অবদান রেখে গেছেন। তিনি সৌরমণ্ডল ও জ্যোতির্মণ্ডল সম্বন্ধে গবেষণা করে পৃথিবীর জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যার নিরবিচ্ছিন্ন গবেষণায় ও সাধনায় তাঁর সারাজীবন কেটেছিল। সর্বপ্রথম পৃথিবীর মানচিত্র তিনিই এঁকেছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম ডিগ্রীর মাপে পৃথিবীর ব্যাস ও পরিধি নিরূপণ করেছিলেন। পরবর্তীযুগে

www.draminlibrary.com

ইউরোপের গবেষণাকারীরা মুসা-আল খারেজমীর এই গবেষণাকেই তাদের গবেষণার মূল ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, বীজগণিতের জন্মদাতা ছিলেন তিনিই। তাঁর 'আল-জবর' নামক বীজগণিতের মৌলিক গ্রন্থ হতে ইউরোপীয় 'এলজেবরা' শব্দটি চয়ন করা হয়েছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে মিস্টার জিরার্ড ল্যাটিন ভাষায় এই 'আল জবর' গ্রন্থখানির অনুবাদ প্রকাশ করেন। বলাবাহুল্য, এই অনুবাদখানা ষষ্ঠদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে বীজগণিতের প্রধান ও প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। তিনি একখানা বিরাট বীজগণিত প্রণয়ন করেছিলেন আর তাতে তিনি সর্বপ্রথম সংখ্যা বাচক চিহ্নগুলি ব্যবহার করে দেখিয়েছিলেন। তাছাড়া আল বাত্তানী, আল ফারগানী, আল বিরুনী, ওমর খৈয়াম ও নাসিরুদ্দীন তুসীর মত মুসলিম মনীষীগণ জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতশাস্ত্রে মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে গেছেন।

সমাজ বিজ্ঞান ও ইতিহাস শাস্ত্রে মুসলমানদের কাছে দুনিয়াবাসী ঋণী। বিখ্যাত মুসলিম মনীষী ইবনে খালদুন সমাজ বিজ্ঞান ও ইতিহাস শাস্ত্রের আবিষ্কারক ছিলেন। তিনি যেসব গ্রন্থ লিখে গেছেন, তন্মধ্যে 'কিতাবুল-ইবার-ওয়া দিওয়ানুল-মূবতাদা' নামক ইতিহাস গ্রন্থখানা তাঁর বিরাট কীর্তি। তিনি তাঁর এই পুস্তকে মানবীয় জীবন যাত্রার প্রণালী ও রীতিনীতি উদ্ভাবনে আর সামাজিক ও রাষ্ট্রিক রূপায়ণে বর্ণের প্রভাব, আবহাওয়ার প্রভাব ও প্রাকৃতিক উৎপন্ন দ্রব্যের প্রভাব কিভাবে প্রতিফলিত হয়, তার বিজ্ঞান সম্মত বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি ছিলেন ইংরেজ বিজ্ঞানী বাক্‌লের পথ প্রদর্শক। ইবনু খালদুন সমাজতত্ত্বের মূল সূত্র আবিষ্কার করে, ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহকে বিচার করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করে–ইতিহাস দর্শনের সৃষ্টি করে গেছেন। ভূগোলে, খগোলে, অর্থনীতিতে শিক্ষা বিজ্ঞানেও তাঁর আশ্চর্য দখল ছিল। কেবলমাত্র ইবনে খালদুনই নন, বলাজুরীর মত, হামাদানীর মত, আল বিরুনীর মত, আত্ তাবারীর মত, আল মাসুদীর মত, ইবনে হজমের মত, ইবনুল আসীরের মত, ইবনুল খল্লকানের মত ও শাহ ওয়ালীউল্লাহর মত শত শত বিশ্ব বিশ্রুত মুসলিম ঐতিহাসিকের অবদানে মানব ইতিহাস সমৃদ্ধ ও উন্নত হয়েছে।

মুসলিম বৈজ্ঞানিক আবুল হাসান সর্বপ্রথম দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন, যাকে তাঁর নিজের ভাষায় দুই প্রান্তে দুইলেন্স বিশিষ্ট একটি চোং বলা চলে। এই চোংগুলিরই উন্নততর সংস্করণ মারাগা ও কায়রোতে পরম সাফল্যের সাথে ব্যবহার করা হয়েছিল। 'আবুল হাসান' ও 'আলী ইবনু আমাজুর'–এই দুই বৈজ্ঞানিক সর্বপ্রথম চন্দ্র সম্বন্ধে গবেষণায় প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

www.draminlibrary.com

আজিজ্ বিল্লাহ ও হাকিম-বি-আমারিল্লাহর রাজত্বকালে কায়রোতে ইবনু ইউনুস নামে এক মহামনীষীর আবির্ভাব ঘটেছিল। তিনিই সর্বপ্রথম পেণ্ডুলাম আবিষ্কার করে তার দোলনের সাহায্যে সময় নিরূপণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি 'জিয়াউল আকবর' নামে একখানা মূল্যবান গ্রন্থের লেখক। জ্যোতিষী কবি ওমর খৈয়াম ফারসী ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন। বলাবাহুল্য এই গ্রন্থখানাই ক্রাইস্থ কক্কাসের বাগ্জালের ভিতর দিয়ে গ্রীকদের মধ্যে প্রসার লাভ করেছিল আর চচৌকিং এর জ্যোতিষ শাস্ত্রের ভিতর দিয়ে চীনাদের মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল। আমরা যাকে চীনের প্রাচীন সভ্যতা বলে দেখতে পাই, আসলে তা মুসলমানদের জ্ঞানালোক-বর্তিকা থেকে ধার করা স্ফুলিঙ্গ বৈ আর কিছুই না।

আগ্রার তাজমহল, জেরুজালেমের ওমরের মসজিদ, কনস্টান্টিনোপল বা ইস্তাম্বুলের সেন্টসফিয়া মসজিদ, কর্ডোভার মসজিদ, স্পেনের আল্হামরা, দিল্লীর দেওয়ানে আম, দেওয়ানে খাস, মতিমসজিদ, জামে মসজিদ প্রভৃতি তৈরি করে মুসলমানরাই স্থাপত্য শিল্পে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। এদেশের প্রায় হাজার বছরের ইতিহাস মুসলমানরাই তৈরি করেছে। পানি পথের প্রথম যুদ্ধে কামান ব্যবহার করে মুসলমানেরাই দুনিয়াবাসীকে কামান ও বারুদের ব্যবহার শিখিয়েছে। গ্রান্ডট্রাঙ্ক রোড তৈরি করে এজাতিই রাস্তা নির্মাণের আদর্শ দেখিয়েছে। ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করে এ জাতিই ডাক বিভাগের সূত্রপাত করেছে।

যে জাতি মাত্র কয়েকটা বছরের মধ্যে পৃথিবীর বুকে এক অখণ্ড আদর্শ-রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিল, যে জাতির আদর্শবাদ, শিক্ষা ও সভ্যতার জ্যোতি আরব ভূমি হতে বিকীর্ণ হয়ে সারা দুনিয়াকে উদ্ভাসিত করেছিল, যে জাতি কর্ডোভা, গ্রানাডা, সেভিল, নিজামিয়া, আল্ আজহার ও নাদ্ওয়াতুল উলামার মত বিশ্ব বিশ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিল, যে জাতির মাঝে আবু বকরের মত ন্যায়পরায়ণ মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছিল, যে জাতির মাঝে হামজার মত, ওমরের মত, খালেদ বিন ওয়ালিদের মত, মুসার মত, তারেকের মত ও মুহাম্মদ বিন কাসেমের মত বীর সন্তানদের অভ্যুদয় ঘটেছিল, যে জাতির মাঝে আবু হানিফার মত, মালিকের মত, মুসলিমের মত, আবু দাউদের মত, নাসায়ীর মত, বুখারীর মত, শাফিয়ীর মত, আহমাদ বিন হাম্বলের মত, তিরমিযীর মত, ইবনু মাজার মত, দায়ালামীর মত, বাইহাকীর মত, খতিবের মত, দারাকুতনীর মত ও দারেমীর মত শত সহস্র ফকীহ ও হাদীস-তত্ত্ব বিশারদের জন্ম হয়েছিল, যে জাতির মাঝে জুনায়েদ বাগদাদীর মত,

www.draminlibrary.com

মারুফ কর্খীর মত, আবদুল কাদের জিলানীর মত, বাহাউদ্দীন নখ্‌শবন্দীর মত, শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দীর মত, শাহ্ জালালের মত, শাহ্ জাকীর আল কাদেরীর মত ও মুজাদ্দিদে আল ফেসানী আহমাদ সরহন্দীর মত, শত সহস্র অলি, দরবেশ, সাধক ও সংস্কারকদের আবির্ভাব ঘটেছিল। ইতিহাস, ভূগোল, খগোল, গণিত, পশুবিদ্যা, চিকিৎসা, স্থাপত্যবিদ্যা, কলাবিদ্যা প্রভৃতি শাস্ত্রে যে জাতির হাজার হাজার পণ্ডিতের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে অলংকৃত করে রেখেছে। যে জাতির লাইব্রেরীগুলি পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ। যে জাতি মহাসমুদ্র মন্থন করে, দুর্জয় গিরি উল্লঘন করে নব নব আবিষ্কারের দ্বারা পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করেছে। যে জাতির অঙ্গুলি হেলনে প্রবল পরাক্রান্ত রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস ও পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের রাজ মুকুট খসে গেছে। যে জাতির জাগ্রত শক্তির সম্মুখে শত্রুর বিপুল সাম্রাজ্যের সুদৃঢ় ইমারতগুলি ভেঙ্গে খানখান হয়ে গেছে। যে জাতি প্রিয় নবীর তিরোধানের পর মাত্র একশ' বছরের মধ্যে এশিয়ার আরব, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, পারস্য, তুর্কিস্তান, কাবুল, কান্দাহার, সিন্ধু ও চীনের মঙ্গোলীয়া পর্যন্ত নিজেদের রাজ্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল। যে জাতির বীরত্ব বলে হাঙ্গেরীয়ায়, অস্ট্রিয়ায় আর ইউরোপে গ্রীস, আলবেনিয়া, রুমানিয়া, সার্বিয়া, বুলগেরিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ায় আর রাশিয়া ও পোল্যান্ডের অংশ বিশেষে আর ক্রীট্‌স, সাইপ্রাস, রোড্‌স ও আয়োনিয়ান প্রভৃতি ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল। যে মুসলিম জাতির ত্যাগ, তিতিক্ষা, মহানুভবতা ও সত্যবাদিতায় মুগ্ধ হয়ে লক্ষ লক্ষ অমুসলমান নিজেদের ধর্ম ছেড়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে ধন্য হয়েছিল। যে মুসলিম জাতির জনসংখ্যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ। কবির ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়–

কোন্ সে জাতির বিজয় পোত
মথ্‌লো মহাসাগর স্রোত,
ভুবনময় কে ওতপ্রোত
গাইলরে দিগ্ বিজয় গান?
মুসলমান সে মুসলমান।

গ্রানাডা ও কর্ডোভার
বক্ষে বিশাল জয় মিনার
উচ্চ চূড়া আল্-হামরার
গড়লো সে কোন্ শক্তিমান?
মুসলমান সে মুসলমান।

www.draminlibrary.com

কালজয়ী সে সমুজ্জ্বল
তক্তে-তাউস তাজমহল
দানলোরে কোন্ কার কুশল
কাল বুকে এই অমর দান?
মুসলমান সে মুসলমান।

কোন্ সেনানী শক্তিময়
তক্তা-এ-হিন্দ করলো জয়
কুফরস্তানে কে নির্ভয়
ঘোষলো নারা পাক আজান?
মুসলমান সে মুসলমান।

কোন্ সে তেজী ঘোড়-সওয়ার
লংঘি মরুদর পাহাড়
ভাঙলো ইরাক সামের দার
জিন্লো ফারেস্ তুরুকস্তান
মুসলমান সে মুসলমান।

অর্ধ চন্দ্র নিশান কার
উড়লো বক্ষে আফ্রিকার
মিশর ভূমে কোন্ সালার
ফুঁক্লোরে তার জয় বিষাণ

মুসলমান সে মুসলমান।
কোন্ সেনানী ভুবন-ত্রাস
রোমের গরব করলো নাশ
করলো স্পেনের বিভব গ্রাস
ক্রুসেড জয়ী কে মরদান?
মুসলমান সে মুসলমান।

খুললো কারা প্রথম দ্বার
দুনিয়াতে নও সভ্যতার
ঘুচিয়ে যুগের অন্ধকার
করলো উজ্জ্বল দীপ্তিমান?
মুসলমান সে মুসলমান।

www.draminlibrary.com

কোন্ সে কওম কোন্ সে জাত
আনলো ধরায় আব্-হায়াত
জ্ঞান ঝর্ণা জ্ঞান প্রপাত
চিন্তা ধারার মুক্তবান?

কুল বিশ্বে বাঁধলো ঘর
দেল কোশাদা কোন্ সে নর
কার কাছে সব আপন পর
বিভেদবিহীন এক সমান?
মুসলমান সে মুসলমান।

বন্দী ধরা হস্তে কার
মুক্তি পেলো পুনর্বার
নাশ্‌লো কে গো যুগ-আঁধার
করলো কে ফের আলোকদান?
মুসলমান সে মুসলমান।

এহেন একটি শ্রেষ্ঠ জাতিকে নিকৃষ্ট বলার স্পর্ধা 'বার্নাড্‌শ' মহাশয় পেলেন কোত্থেকে?–এ প্রশ্ন হয়তো অনেককেই ভাবিয়ে তুলবে। কারণ যে ধর্ম পৃথিবীর সেরা ধর্ম, সেই ধর্মের ধারক, বাহক ও প্রচারকরা কি কখনও নিকৃষ্ট হতে পারে? তবে একথাও ঠিক, সেই ধর্মের নীতি যদি তারা মেনে না চলে, নিজেদের অতীতের গৌরব ও মহিমাকে তারা যদি বিস্মৃতির অতল তলে ডুবিয়ে দিয়ে থাকে–তাহলে জাতি শ্রেষ্ঠত্বের আসনে থাকতে পারে কিনা–এটাও ভেবে দেখতে হবে। নেহায়েত অপ্রীতিকর হলেও মাথা নত করে এ কথা আমাদেরকে স্বীকার করতেই হবে যে, ইসলামের সুমহান আদর্শ থেকে আমরা আজ অনেক নীচে নেমে গেছি। আমরা যে এক গৌরবময় ইতিহাস ও এক অতুলনীয় ঐতিহ্যের অধিকারী ছিলাম–একথা যেন ভুলেই গেছি। আমাদের অনুভূতিটুকুও যেন একেবারে লোপ পেয়ে গেছে। কর্মদোষে সবকিছু আজ হারিয়ে ফেলেছি। আমলকে করেছি কলঙ্কিত, কার্যকলাপ হয়েছে আমাদের নিকৃষ্ট। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের অপর নাম হচ্ছে ইসলাম। যারা কুরআন ও হাদীসের নীতি মেনে চলে তারাই প্রকৃত মুসলমান। আর যারা মেনে চলে না তারা নামে মাত্র মুসলমান। সত্যিকারভাবে আমরা যদি কুরআন ও হাদীসের আলোকে নিজেদের আমলগুলিকে পরীক্ষা করে দেখি, তাহলে একথা পরিষ্কার হয়ে উঠবে যে 'নামে গয়লা কাঁজি ভক্ষণ' প্রবাদ বাক্যের মতই আজ আমরা নামে মাত্র মুসলমান।

www.draminlibrary.com

অবশ্য কোটির মধ্যে গুটি'র মত দু-চারজন মুসলমান ইসলামের নীতি মেনে চলার যে চেষ্টা করেন না–তা নয়। কিন্তু যে জাতির হাজারে ন'শো নিরানব্বই জন লোকই ইসলামের অনুশাসন মেনে চলে না, তাদেরকে কী বলা যাবে? আমরা যদি সত্যিকার মুসলমান হতাম, তাহলে অপর জাতির 'বলির পাঁঠা' হয়ে আমাদেরকে থাকতে হতোনা। আমরা যদি আজ ইসলামী আদর্শে নিজেদের জীবনকে গড়ে তুলতে পারতাম, তাহলে মৌলিক গবেষণা হতে কখনো পিছনে পড়ে থাকতাম না, অপর জাতির দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকতে হতো না। আমরা আজ অপর জাতির লাথি ঝাঁটা কেন খাচ্ছি, সেটা প্রত্যেকের চিন্তা করা দরকার। তাই বলি বার্নাডশ' ঠিকই বলেছেন, সঠিক চিত্রটাই তিনি আমাদেরকে এঁকে দিয়েছেন। শুধু বার্নাডশ' কেন, আল্লামা কবি ইকবালও বলেছেন–

উহ্ দুনিয়া মেঁ মুআয যায্ থে
মুসলমান হোঁ-কর্
আজ তোম্ যলীল ও খার হুয়ে
তারেকে কুরআঁ হো-কর্
বিশ্বে তারা ছিল সেরা হয়ে মুসলমান
আজকে তারা লাঞ্ছিত ছাড়িয়া কুরআন।

পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা কতদূর সরে পড়েছি, আর এজন্য আমরা অধঃপতনের অতল তলে কিভাবে তলিয়ে গেলাম, সে সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি।

আমাদের মধ্যে একতা কোথায়?

আমাদের মধ্যে আজ একতা বলে কোন বস্তু আছে কি? নেই। অথচ মুসলমান জাতির সবচেয়ে বড় কথা হলো এই একতা। পবিত্র কুরআনের নির্দেশ "লা তাফার্‌রাকু" তোমরা নানা দলে ও নানা মতে বিভক্ত হয়ে নিজেদের সংহতিকে ধ্বংস করো না। আফসোস, আমরা পবিত্র কুরআনের এই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ অমান্য করে শত শত দলে ও মতে বিভক্ত হয়ে নিজেদের সংহতিকে ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলেছি। লক্ষ লক্ষ ইট দিয়ে যে ঘর তৈরি হয়, সে ঘরের বিভিন্ন স্থানে যদি ফাটল ধরে, তাহলে সে ঘরের যে অবস্থা হয়, আমাদের অবস্থা ঠিক তাই হয়েছে। ফাটা দালানকে চুনকাম করে যেমন টিকানো যায় না, ফাটল বন্ধ করার উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারলে তবেই রক্ষা–ঠিক তেমনি

www.draminlibrary.com

মুসলমানদেরকে সংহতির বিধ্বস্তি থেকে রক্ষা করার উপযুক্ত উন্নতির কোন সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু রক্ষা করবে কে? যে সর্ষে ভুত ছাড়াবে, সেই সর্ষেতেই যদি ভুত আছর করে বসে থাকে তো উপায় কি? প্রিয় নবী (সঃ) বলেছেন, আমার উম্মত একটি দেহের ন্যায়। দেহের এক অংশে আঘাত লাগলে অন্য অংশগুলি যেমন ব্যথিত হয়, ঠিক তেমনি এক মুসলমান কষ্ট পেলে অন্য মুসলমান ব্যথিত হবে। শুধু ব্যথিতই নয়, সর্বশক্তি নিয়ে তার দুঃখ মোচনের জন্য এগিয়ে যাবে। কিন্তু আমরা তা করি কি? ব্যথিত হওয়াতো দূরের কথা, আরও কেমন করে বিপদে পড়বে সে কামনাই করে থাকি। এক ভাই কষ্ট পেলে আর এক ভাই দাঁতের গোড়ায় গোড়ায় হাসি–মনে মনে বড় আনন্দ পাই। একজনের উন্নতি দেখে আর একজন হিংসায় জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাই। অথচ মুখে আমাদের ষোলআনা বড়াই আমরা মুসলমান। আমরা সবাই ভাই ভাই।

রাজনীতি ক্ষেত্রে কোন দিন আমরা সংহতি রক্ষা করে চলতে পারিনি। প্রিয় নবীর তিরোধানের পর পরই গদী নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে দলাদলির সৃষ্টি হয়। অবশ্য হযরত ওমরের বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার জন্য ঝগড়া থেমে গেলেও হযরত ওসমানের সময় তা আবার জ্বলে উঠে। তারপর হতে এ পর্যন্ত রাজনীতির লড়াই আর থামেনি। আজ আমরা বহু রাজনৈতিক দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছি। আর ইসলাম ইসলাম বলে সবাই চীৎকার করছি। কোন মতেই আমরা এক হতে পারছিনা। কেন আমরা এক হতে পারি না, তা সূর্য্যের ন্যায় মতই পরিষ্কার। তা হলো দুনিয়ার স্বার্থ। ইসলামকে সবাই আমরা 'ক্যাপিটাল ধরে নিয়েছি আর লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের গদী দখল। ইসলাম যদি আমাদের লক্ষ্য হতো, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা এক দলভুক্ত হতে পারতাম। কিন্তু তা পারি না। কোন দল কোন দলকে আমরা "ক্ষমতা" ছেড়ে দিতে রাজী নই, অথচ সবাই চাই ইসলাম। তাই কার্যক্ষেত্রে দেখতে পাই একদল অন্য দলকে উচ্ছেদ করে, এক দল অন্য দলকে নিশ্চিহ্ন করে তার শবদেহের উপর গদী কায়েম করতে চায়। লক্ষ লক্ষ মুসলমানের রক্তে হলি খেলতে হয় খেলবো, লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে গৃহহারা করতে হয় করবো, লক্ষ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট করতে হয় করবো; অসংখ্য প্রতিভাকে চির বিদায় দিতে হয় দিব, স্বামীহারা নারীর আর্তস্বরে, পুত্রহারা জননীর বুক ফাটা ক্রন্দনে, কচি কচি বাচ্চার করুণ আর্তনাদে আল্লাহর আরশ কেঁপে যায় যাক-তবু আমাকে গদী দখল করতেই হবে। পৃথিবীর উন্নত শহরে একটা বাড়ী আমাকে কিনতেই হবে। আমার পরে আমার চৌদ্দপুরুষ যাতে বসে খেতে পায় তার ব্যবস্থা আমাকে করে যেতেই হবে। এই হল আমাদের রাজনীতি।

www.draminlibrary.com

এবার আকাঈদ ও মতবাদের দিক দিয়ে আমাদের মধ্যে একতা আছে কি না দেখা যাক। না, সেখানেও আমরা এক নই–শত শত দলে বিভক্ত। কেউ বলেন- আমি সুন্নী, কেউ বলেন আমি হানাফী, কেউ বলেন আমি মালিকী, কেউ বলেন আমি শাফিঈ, কেউ বলেন আমি হাম্বলী, কেউ বলেন আমি রাফেজী, কেউ বলেন আমি মুর্জী, কেউ বলেন আমি মুআত্তেলী, কেউ বলেন আমি মুনাব্বেহী, কেউ বলেন আমি মুতাজেলী, কেউ বলেন আমি আওযায়ী, কেউ বলেন আমি আশায়েরী, কেউ বলেন আমি আদ্হামী, কেউ বলেন আমি আহ্মাদী, কেউ বলেন আমি কলন্দরী, কেউ বলেন আমি নিজামী, কেউ বলেন আমি নখ্শবন্দী, কেউ বলেন আমি কাদেরী, কেউ বলেন আমি মাদারী, কেউ বলেন আমি জালালী, কেউ বলেন আমি চিশ্তী, কেউ বলেন আমি ইসমাইলী, কেউ বলেন আমি মাইজ ভাণ্ডারী, কেউ বলেন আমি কীর্তনিয়া, কেউ বলেন আমি জাব্বারিয়া, কেউ বলেন আমি পাঁচপীরিয়া, কেউ বলেন আমি বাউলিয়া, কেউ বলেন আমি বুদ্ধ শায়েরীয়া, কেউ বলেন আমি শাহজিয়া, কেউ বলেন আমি ন্যাড়া, কেউ বলেন আমি মালেকানা, কেউ বলেন আমি কবীরপন্থী, কেউ বলেন আমি দাউদপন্থী, কেউ বলেন আমি সোহাগী, কেউ বলেন আমি সন্দ্রেশী, কেউ বলেন আমি নাগর্দী, কেউ বলেন আমি দরিয়া পীরের শিষ্য, কেউ বলেন আমি সাগর পীরের শিষ্য। এসব ছাড়া যেখানে সেখানে নানা ধরনের তথাকথিত বুজরুগ ব্যক্তিদেরকে কেন্দ্র করে কত দলে যে আমরা বিভক্ত হয়ে পড়েছি–তার ইয়ত্তা নেই। প্রুশিয়া ইউনির্ভাসিটির সেমেটিক ফিলোলজীর প্রফেসর রেভারেন্ড হর্টন সাহেব বলেছেন, অষ্টম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম জাতি একশত দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। (Reconstruction of Religious thought of Islam)

বলাবাহুল্য প্রত্যেক দলই নিজ নিজ প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে হাঁক ছাড়ছেন–আমার নীতি ও আমার তরিকাই ভাল, আমিই খাঁটি মুসলমান। একদল বলছেন এটা হালাল, আর একদল বললেন, না–ওটা বিলকুল হারাম। কেউ বলেন, 'মুসাফা' এক হাত হবে। কেউ বলছেন দু'হাত দিয়ে হবে আর কেউ বলছেন না, ওটা কাঁচি মার্কা হবে। কেউ বলছেন ض অক্ষরের উচ্চারণ 'দ' এর মত হবে অর্থাৎ গদব, মর্দী, ফদল, দোহা, রামাদান, কাদী বলতে হবে। কেউ বলেন না, ض অক্ষরের উচ্চারণ 'য' এর মত হবে অর্থাৎ গযব, মর্যী, ফযল, যোহা, রামাযান কাযী বলতে হবে। কেউ বলেন ক্ববরের কাছে মানত করা জায়েয, কেউ বলেন না হারাম। এভাবে নামায, রোযা, হাজ্জ, যাকাত, আযান, একামত, তসবীহ্-তাহলিল, যিকির-আযকার, বিবাহ-সাদী, মৃতের কাফন-দাফন, দু'আ-দরূদ, বিবি তালাকের ফতোয়া প্রভৃতি শরীয়তের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে

www.draminlibrary.com

মতভেদ ও দলাদলি আমাদের মধ্যে লেগেই আছে। এ সব দেখে শুনেই নজরুল ইসলাম লিখেছেন ঃ

বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে
আমরা তখনও বসে
বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজেছি
ফেকা ও হাদীস চষে।
হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলীর
তখনো মেটেনি গোল
এমন সময় আজরাঈল এসে
হাঁকিলো তল্‌পী তোল্‌।
বাহিরের দিকে যত মরিয়াছি
ভিতরের দিকে তত
গুন্‌তিতে মোরা বাড়িয়া চলেছি
গরু ছাগলের মত।

আল্লামা কবি ইকবালও এসব দেখে শুনে বড় দুঃখ প্রকাশ করে লিখেছেন ঃ

দীনে কাফের ফেক্‌রো তাদ্‌বীরো জেহাদ
দীনে মোল্লা ফী সাবিলিল্লাহ ফাসাদ।

কাফিরের ধর্ম হয়েছে চিন্তাশীলতা প্রচেষ্টা আর সংগ্রাম। আর মোল্লার ধর্ম হয়েছে আল্লাহর ওয়াস্তে ফাসাদ।

কবি সঠিক চিত্রই তুলে ধরেছেন। দুনিয়ার সকল জাতিই যখন ধাপে ধাপে উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে, তখন এই মুসলমান জাতিই কেবল আপোষে ঝগড়া-বিবাদ করে **অত্যধিক সাহসিকতার সহিত বীর বিক্রমে পিছনের দিকে হটিয়া যাইতেছে। আফসোস–শত আফসোস!**

এই যে শত শত দল, এ সবের মূলে যদি অনুসন্ধান করা যায় তাহলে দেখা যাবে এক একজন প্রতিভাবান ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই এক একটি দলের সৃষ্টি হয়েছে। এ পর্যন্ত যত রাজনৈতিক দল তৈরি হয়েছে বা হতে আছে–সব দলের মূলে আছেন একজন করে রাজনৈতিক লীডার! ধর্মের নামেও যত দল তৈরি হয়েছে বা হতে আছে–এ সবের মূলেও আছেন এক একজন করে ধর্মীয় নেতা। ধর্মীয় নেতারা কুরআন ও হাদীসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রঙে ও বিভিন্ন ঢঙে নিজেদের মতবাদ প্রচার করেছেন বলেই এক ধর্মীয় দল তৈরি হয়েছে। সর্বপ্রথম

www.draminlibrary.com

মাযহাবী দলাদলির সৃষ্টি হয় মহামতি ইমাম চতুষ্টয়কে কেন্দ্র করে। কারণ কোনই ইমামই প্রিয় নবীর তেইশ বছরের সামগ্রিক হাদীস সংগ্রহ করতে পারেননি। ফলে বাধ্য হয়ে তাঁদেরকে কিয়াসের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। যিনি যত কম হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন, তাঁকে তত বেশী কিয়াস করতে হয়েছিল। অবশ্য প্রত্যেক ইমাম বলে গেছেন, এমন এক সময় আসবে যখন তোমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামগ্রিক হাদীস চোখের সামনে দেখতে পাবে। তখন আমাদের এই কিয়াসগুলোকে আল্লাহর নবীর হাদীসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখো। যদি মিলে যায় উত্তম, আর যদি না মিলে, তাহলে আমাদের অভিমত বাদ দিয়ে আল্লাহর নবীর সিদ্ধান্তকেই গ্রহণ করবে। কিন্তু পরবর্তী যুগে তা আর হলো না। প্রিয় নবীর সামগ্রিক হাদীস পাওয়া সত্ত্বেও কুরআন ও হাদীসের কষ্টি পাথরে কিয়াসী মাসআলাগুলোকে পরীক্ষা করার কোন ব্যবস্থাই অবলম্বিত হলো না। ইমামগণের তিরোধানের পর তাঁদের ছাত্ররা যখন বিরাট বিরাট আকারে পৃথক পৃথকভাবে মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন দেখা গেলো অতি ভক্তির আতিশয্যে তাঁরা আপন আপন ওস্তাদের সিদ্ধান্তগুলোকে সিলেবাসে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। ফলে আলেম তৈরির কারখানা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলো। এবং পরে ইমামগণের নামানুযায়ী এক একটা দলের নামকরণও করে নেওয়া হলো। যেমন ইমাম শাফেয়ীর নামানুযায়ী শাফিয়ী মাযহাব, ইমাম মালিকের নামানুযায়ী মালিকী মাযহাব ইত্যাদি। কিন্তু একটি প্রশ্ন, যে সকল ইমামদের নামানুযায়ী এক একটি দলের নামকরণ করে নেওয়া হলো, সেই সব মহামতি ইমামদের জন্মের আগে মুসলমান ছিলেন কিনা? যদি থেকে থাকেন তাহলে তাঁরা কোন্ দলভুক্ত ছিলেন? আমরা যদি একটু চিন্তা করি তাহলে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবো যে, মহামতি ইমামগণের পূর্বের হাজার হাজার সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন এবং তাঁরা প্রত্যেকে কুরআন ও হাদীসপন্থী মুসলমান ছিলেন।

যা হোক দল চতুষ্টয়কে কেন্দ্র করে অন্ধভক্তির আতিশয্যে ধর্মের নামে পরবর্তী যুগে শত শত দলের সৃষ্টি হয়েছে এবং এখনো হতে আছে। এ সবের মূলে যে শিক্ষার অভাব–তা নয়। আল্লাহর মর্জি চক্রবৃদ্ধি হারে শিক্ষিতের হার আমাদের মধ্যে বেড়েই চলেছে, কত জ্ঞানী-গুণী, হাফেজ, কারী, মৌলভী, মাওলানা, মুনশী, মুফতী, ইমাম, খতীব, ফকীহ্, বক্তা, হাদীয়ে জামান, মুজাদ্দেদে মিল্লাত, মুফতীয়ে আজম, শামসুল উলামা, পীরে কামেল যে আমাদের মাঝে আছেন, তার ইয়ত্তা নেই। এ সবের পরও দলের সংখ্যা বাড়তেই আছে। তার একমাত্র কারণ, শিক্ষিত ব্যক্তি বা অন্ধভক্তির আতিশয্যে এক একটি করে

www.draminlibrary.com

দলের ওকালতি করছেন। ফলে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব মোটেই গড়ে উঠতে পারছেনা। আমাদের দেশের বহু গণ্যমান্য আলেমকে দেখা যায়, সারা জীবন ধরে তাঁরা অন্য দলের বিরুদ্ধে বই পুস্তক লিখে শক্তি ক্ষয় করে গেছেন। কোন্ দলের হাফেজের পিছনে নামায হবে না, কোন্ দলের মুহাদ্দিসের কাছে হাদীস পড়া হারাম, কোন্ দলের মাওলানার সাথে মেয়ের বিয়ে দেওয়া চলবে না, কোন্ দলের দাওয়াত নেওয়া নাজায়েয-ইত্যাদি বিষয় নিয়েই তাদের মাথা ব্যথা বেশী। আমার মনে হয় মাননীয় আলেম সমাজ মাযহাবী ঝগড়া বাদ দিয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মৌলিক নীতিতে এক হয়ে সংহতিকে ফিরিয়ে আনার জন্য তাঁদের পাণ্ডিত্যকে যদি কাজে লাগাতেন, তাহলে শতধা বিচ্ছিন্ন এই মুসলমান জাতি সংহতি রক্ষায় এগিয়ে যেতে পারতো। ইকবালও বলেন–

মুনফাআত্ এক হ্যায় ইস্ কওম কী
আওর নুক্সান ভী এক
এক হী সব্কা নবী দীন ভী
ঈমান ভী এক
হেরেম্ পাক ভী আল্লাহ ভী
কুরআঁ ভী এক
কুছ্ বড়ী বাত্থী? হো-তে
জো মুসলমাঁ ভী এক।

এই মুসলমান জাতির লাভও এক, লোকসানও এক। সকলের নবী এক। সকলের একই ধর্ম, একই ঈমান। এক কাবা, এক আল্লাহ্, এক কুরআন সকলের, সুতরাং মুসলমান যদি এক হতে পারতো, তবে সেটা কি খুব বড় কথা হতো?

এই দলাদলিই যে আমাদেরকে অধঃপতনের অতল তলে নিক্ষেপ করেছে, নিম্নের ঘটনাবলী থেকে তার কিঞ্চিত আভাস আমরা পেতে পারি।

দলাদলির জঘন্য পরিণাম

মুসলমানদের দুর্ভাগ্য যে, প্রিয় নবীর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে দলাদলির সূত্রপাত হয়ে গেলো। আনসারদের অন্যতম খয্রজ গোত্রের নেতা সা'দ বিন উবাদা খলীফা হওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করলেন। আনসারগণ ভিতরে ভিতরে তাঁকে খলীফা মনোনীত করতে উদ্যত হলেন। বানু

www.draminlibrary.com

হাসেমগণ হযরত আলীকে খলীফা মনোনীত করার জন্য একটি দল গঠন করলেন। বানী জুহুরাগণ সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসকে খলীফা মনোনয়নের জন্য দল গঠন করলেন। এদিকে বনু উমাইয়াগণ হযরত উসমানকে খলীফা মনোনীত করার জন্য আর একটি দল গঠন করলেন। এত দলাদলির মধ্যে হযরত ওমর ফারুকের উপস্থিত বুদ্ধির ফলে বহু আপত্তি সত্ত্বেও হযরত আবু বকরকেই খলীফা মনোনীত করা হলো। সা'দ বিন উবাদা ও হযরত আলী ছাড়া সকলেই হযরত আবু বকরের নিকট শপথ গ্রহণ করলেন, (অবশ্য) ছয় মাস পর হযরত আলীও শপথ গ্রহণ করেছিলেন। যা হোক, হযরত আবু বকর খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর তাঁর আমলে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। এবং তিনি মৃত্যুশয্যায় বিশিষ্ট সাহাবাগণের সাথে পরামর্শ করে হযরত ওমরকে খলীফা নির্বাচন করে গিয়েছিলেন। হযরত ওমর সম্পর্কে প্রিয় নবী (সঃ) বলেছেন, আমিই শেষ নবী, আমার পর কোন নবী নেই। আমার পর কোন নবীর আগমন ঘটলে ওমরকেই নবী করা হতো। অন্য এক হাদীসে আল্লাহর নবী হযরত ওমরকে শক্তিশালী ও আমীন বলে আখ্যায়িত করেছেন। এহেন হযরত ওমর দশ বছর যাবত খিলাফতে ইলাহিয়ার গৌরব মণ্ডিত আসনে অধিষ্ঠিত থাকার পর মসজিদে ফজরের নামাযে ইমামতি করার সময় ঘাতকের হাতে শহীদ হলেন কেমন করে? তা চিন্তা করে দেখার দরকার। যে ব্যক্তি হযরত ওমরের পেটে ছুরি মেরেছিল, সেই দুর্বৃত্ত ফিরোজ বহু মুসল্লীর সামনের কাতারে ইমামের পিছনেই ছিল। তাহলে এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে রহস্য কি? তবে একথা ঠিক যে, আল্লাহর নবীর তিরোধানের ঠিক চার দিন পূর্বে তাঁর পীড়া যখন খুব গুরুতর আকার ধারণ করেছিল, তখন তিনি খলীফা নিযুক্তির ব্যাপারে একখানা দলিল সম্পাদন করতে চেয়েছিলেন। মুসলিম শরীফে আরও পাওয়া যায়, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহর নবী যদি কাউকে স্থলাভিষিক্ত করে যেতেন, তাহলে প্রথমে আবু বকরকে, তারপর ওমরকে, তারপর আবু উবায়দা বিনুল জাররাহকে স্থলাভিষিক্ত করে যেতেন। যা হোক আল্লাহর নবী যখন দলিল সম্পাদন করতে চেয়েছিলেন, তখন হযরত ওমর বলেছিলেন, প্রিয় নবী পীড়ার যন্ত্রণায় ভীষণ কষ্ট পাচ্ছেন, তাঁর এরূপ অসুস্থতার মধ্যে তাঁকে দলিল লেখার কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। বাস আর যায় কোথায়! একদল মুসলমান হয়ে গেল হযরত ওমরের শত্রু। তারা বলতে লাগলো, হযরত আলীর নামেই আল্লাহর নবী উত্তরাধিকার পত্র লিখে দিতেন কিন্তু ওমর তা হতে দিলো না। এই বলে তারা একটি ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে শুরু করে দিলো। ফারুকে আজম হযরত ওমরের ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের মূলে এই ষড়যন্ত্র যে ক্রিয়াশীল ছিল না, তা কেউ জোর করে বলতে পারেন না।

www.draminlibrary.com

তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান একজন ফেরেশতা স্বভাবের মানুষ ছিলেন। রসূলুল্লাহর দুই কন্যার পানি পান করার গৌরব অর্জন করে তিনি 'যুননূরাইন' উপাধি লাভ করেছিলেন। হযরত ওমরের পর তিনিই উপযুক্ত বিবেচিত হয়ে খলীফা নিযুক্ত হন। আল্লাহর নবীর তিরোধানের পর হযরত আবু বকরের খিলাফত, হযরত ওমরের খিলাফত ও হযরত উসমানের খিলাফতের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত নগণ্য সংখ্যক মুসলমান আভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকলেও ইসলামী রাষ্ট্রে যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করেছিল, পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনাই নেই। ত্রিশ হিজরী পর্যন্ত মুসলমানগণ পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলি অধিকার করে এমন এক আদর্শ রাষ্ট্র স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিল যে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলগুলির অস্তিত্ব তার কাছে ম্লান হয়ে গিয়েছিল। তখনকার দিনে মুসলমান ইচ্ছা করলে আসুরিক বলে সারা পৃথিবী জয় করে নিতে পারতেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের নীতি ইসলামী আদর্শের অনুকূলে নয় বলে, সে কাজ থেকে তাঁরা বিরত ছিলেন। দিন দিন মুসলমানদের চরমোন্নতি দেখে অমুসলমানদের একটি বিশিষ্ট দল জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছিল। তারা দেখলো শক্তি পরীক্ষায় ইসলামকে পরাস্ত করা যাবে না। তাই ইসলামকে বিপন্ন করার আর মুসলমান শক্তিকে প্রতিহত করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তারা ছদ্মবেশে মুসলমান হতে লাগলো। ইসলাম ধর্মে শ্রেণী সংগ্রাম নেই, কৌলিণ্যের অভিমান নেই, বংশীয় ও গোত্রীয় প্রাধান্য নেই। ইসলামে আছে ভেদহীন ও শ্রেণীহীন ভ্রাতৃত্ব। ভ্রাতৃত্বের এই প্রাণস্পর্শী চেতনাই হচ্ছে জাতির প্রাণশক্তি। ইবাদত ও জাতীয়তার এই অপূর্ব একত্ব যা ইসলামে তাওহীদ নামে কথিত। শত্রুরা বাহির হতে ইসলামের দুর্ভেদ্য দূর্গে আঘাত হানতে অপারগ হয়ে তার ভিতরে প্রবেশ করতে আরম্ভ করলো। আর মুসলিম সংহতিকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়ার ষড়যন্ত্র করতে লাগলো। এই ষড়যন্ত্রকারীদের লীডার ছিল আব্দুল্লাহ ইবনু সাবা। সে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে বানী হাশিম ও বানী উমাইয়াদের মধ্যে যে শত্রুরা ছিল তাকে ঝালিয়ে তুলতে লাগলো। রসূলের বংশধরদের শ্রেষ্ঠত্ব, হযরত আলীর নবুওত প্রভৃতি সম্পর্কে মদিনা, কুফা, বসরা, দামেশ্ক ও কায়রো শহরগুলোতে জোর প্রচারণা চালাতে লাগলো। আর খুব চালাকীর সাথে ও অত্যধিক সাবধানতার সাথে হযরত উসমানের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলার চেষ্টা করতে লাগলো। সাহাবাগণ ইসলামের মৌলিক নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন বলে ইবনু সাবা মদিনায় বিশেষ কোন সুবিধা করতে না পেরে বসরা, কুফা ও কায়রো গমন করলো। ঐসব স্থানের মুসলমানদের মাঝে তার ষড়যন্ত্র বিপুলভাবে সার্থকতা লাভ করলো। কিন্তু আহাম্মক মুসলমান বুঝলো না–নও মুসলিম ইবনু সাবার ষড়যন্ত্রের কথা। তারা নিজেদের সংহতিকে নষ্ট করে বিদ্রোহী সেজে ইবনু সাবার নেতৃত্বে পঁয়ত্রিশ

www.draminlibrary.com

হিজরীতে ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থল মদিনায় চড়াও করলো আর আমিরুল মুমিনীন হযরত উসমানকে পৈশাচিকভাবে হত্যা করলো। ভিতরে ভিতরে এই ষড়যন্ত্রে ও হত্যাকাণ্ডে মদিনারও কিছু সংখ্যক মুসলমান শরীক ছিল।

মুসলমানরা হযরত উসমানকে যেদিন কতল করলো, সেদিন তিনি বাড়ীতে বসে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন। এমন সময় কয়েকজন যুবক প্রাচীর টপকে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলো। একজন যুবক ছুটে যেয়ে হযরত উসমানের দাড়ি চেপে ধরলো। হযরত উসমান চেয়ে দেখেন, যে যুবক দাড়ি ধরেছে সে আর কেউ নয়–হযরত আবু বকরের পুত্র মোহাম্মদ। হযরত উসমান অশ্রুভরা নয়নে বললেন, হে যুবক! তোমার পিতা বেঁচে থাকলে এ দাড়ির কদর তিনিই করতেন। যুবকের অন্তর কেঁপে উঠলো। সে দাড়ি ছেড়ে দিয়ে পিছনে হটে দাঁড়ালো। কিন্তু অন্যান্য যুবকদের প্রাণে দয়া হলো না। তারা নির্দয়ভাবে হযরত উসমানের বুকে ছুরি বসিয়ে দিল। তিনি ছটফট করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। হযরত উসমানের স্ত্রী ঘরের ছাদে উঠে চীৎকার করে বললেন, ওগো মুসলমান শুনো, তোমাদের কয়েকজন যুবক ছেলে এসে আমিরুল মুমিনীনের বুকে ছুরি মেরে চলে গেল। মুসলমানরা এসে দেখলো প্রিয় নবীর জামাতা, মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমানের লাশ, পবিত্র কুরআনের উপর পড়ে রয়েছে। এহেন একটি অনন্যসাধারণ মনীষাকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হলো গৃহ বিবাদের জন্যই। হযরত উসমানের এই হত্যাকাণ্ডে মুসলমানদের গৃহযুদ্ধের দরজা প্রকাশ্যভাবে খুলে গেল। এই হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করেই হযরত আয়েশার সহিত হযরত আলীর জামালের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আর হযরত মুয়াবিয়ার সহিত হযরত আলীর সিফফীনের লড়াই সংঘটিত হয়।

হযরত উসমানের শাহাদাতের পর হযরত আলীই ছিলেন সর্বাধিনায়কত্বের যোগ্য পাত্র। কারণ তাঁকে আল্লাহর রসূল হাদী ও মাহ্দী বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি ছিলেন বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবার অন্যতম। তিনি ছিলেন আল্লাহর নবীর চাচাতো ভাই ও জামাতা। তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান ও ধার্মিক। তিনি ছিলেন পৃথিবীর অন্যতম বীর। জননী খাদিজাতুল কুবরার পর তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এসব গুণের জন্যই তিনি হযরত উসমানের পর খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এহেন একজন মহাপুরুষের খিলাফতে মুসলমানরা একমত হতে পারেনি। হযরত মুয়াবিয়া আল্লাহর নবীর শ্রেষ্ঠ সাহাবা ছিলেন। চল্লিশটি জিহাদে তিনি শরীক হয়েছিলেন। তিনিও রাজা হওয়ার দুর্বার আকাঙ্ক্ষায় পাগল হয়ে গেলেন। এবং বিভিন্ন অজুহাতে হযরত আলীর সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। আর শেষে সাম্রাজ্যবাদ

www.draminlibrary.com

কায়েম করেই ছাড়লেন। শুধু তাই নয়, খারেজীরাও হযরত আলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। রাফেজীরাও তাঁকে উপলক্ষ করে এক ভয়াবহ ফিতনার দারোদঘাটন করেছিল। এইসব গৃহযুদ্ধে মুসলমানদের যে সর্বনাশ হয়েছে, পরবর্তীকালে তা আর পূরণ হয়নি। এসব ফিতনার পরিণতি স্বরূপ হযরত আলীর মত মহাপুরুষকে ঘাতকের হাতে শহীদ হতে হলো। হযরত আলীকে হত্যা করার ফলে ইসলামে গণতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটে গেল।

মুয়াবিয়ার পুত্র ইয়াজিদ যখন বাদশাহ হলো ইমাম হোসেন (রাঃ) তার স্বৈরাচারী শাসকের কাছে মাথা নত করলেন না। যার ফলে ইমাম হোসেনকে 'বায়আত' গ্রহণ করবো বলে ধোঁকা দিয়ে কুফায় আহ্বান জানানো হলো। ইমাম হোসেন ব্যাপারটা বুঝার জন্য তাঁর সম্পর্কিত ভাই মুসলিমকে কুফা পাঠিয়ে দিয়ে পরে পরেই স্বপরিবারে কুফা রওয়ানা হয়ে গেলেন। পথে শুনলেন যে, মুসলিমকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। তখন তিনি ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পেরে কুফার রাস্তা ছেড়ে দিয়ে ফুরাত নদীর পশ্চিম শাখার তীর বেয়ে চলতে লাগলেন। কুফার পঁচিশ মাইল উত্তরে ফোরাত নদীর তীরে কারবালার মরুপ্রান্তরে ইমাম হোসেনকে অবরোধ করা হলো। ইমাম হোসেন বলেছিলেন, আমাকে তোমরা সরাসরি মদিনায় ফিরে যেতে দাও আর না হয় ইয়াজিদের কাছে নিয়ে চলো। ইমামের এ কথায় কোন মুসলমানই কর্ণপাত না করে তাঁকে ও তাঁর পরিবারের মধ্যে কেবল জয়নুল আবেদীন নামক কচি শিশুকে বাদ দিয়ে সকল পুরুষ সন্তানকে পৈশাচিকভাবে হত্যা করলো। এভাবে মুসলমানরা গৃহযুদ্ধ করে মুসলিম গগণের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ককে খসিয়ে দিল। ইমাম হোসেনের হত্যা ছাড়াও ইয়াজিদের শাসনামলে হারবার লড়াই আর মক্কায় হযরত আব্দুল্লাহ বিন জুবায়রের অবরোধ, মারোয়ানের সময় নোমান বিন বশিরের সাথে মার্জেরাহিতের হাঙ্গামা, খলীফা আব্দুল মালিকের শাসনামলে মসঅব ও তার ভাই আব্দুল্লাহ বিন জুবায়রের বিদ্রোহ ও কাবা শরীফকে ঘেরাও করার কাণ্ড, হিশামের সময় জায়েদ বিন আলীর বিদ্রোহ, মারোয়ানের শাসনামলে আবু মুসলিম খোরাসানীর বিদ্রোহ, মনসুর আব্বাসীর খিলাফতে মদিনায় মোহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন হাসামের আর বসরায় তার ভাই-এর বিদ্রোহ প্রভৃতি মুসলমানদের এই গৃহ বিবাদগুলি জাতিকে চরম পতনের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

সমগ্র মুসলিম জাহানের মুসলমানরা তেরশো বছর ধরে গৃহযুদ্ধ করে করে নিজেদের কত যে সর্বনাশ ঘটিয়েছে তার পূর্ণ বিবরণ পেশ করা অসম্ভব। কেবল দুনিয়ার স্বার্থ ও গদীর নেশায় কত ভাই যে তার ভাইয়ের বুকে ছুরি মেরেছে, কত

www.draminlibrary.com

পুত্র যে তার পিতাকে শেষ করেছে, কত মুসলমান যে কত মুসলমানকে রক্ত সাগরে ভাসিয়েছে, কে তার ইয়ত্তা করবে? কেবল এ হিন্দ উপমহাদেশের কথাই ধরা যাক। মোহাম্মদ বিন কাসেমের মত একজন সিন্ধু বিজয়ী, সাহসী, ন্যায়পরায়ণ, মহৎ ও উদারচেতা বীর সন্তানকে বাদশাহ সোলায়মান শুধু রাজনৈতিক স্বার্থেই পৈশাচিকভাবে হত্যা করেছিল। মোহাম্মদ ঘোরীও কেবল রাজনৈতিক স্বার্থে গজনী বংশের শেষ সুলতান খসরু মালিক ও তাঁর পুত্র বাহারামকে পরাজিত ও বন্দী করে সুলতান গিয়াসুদ্দীনের নিকট প্রেরণ করেছিল আর তাঁদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে গজনী রাজত্বের চির অবসান ঘটানো হয়েছিল। ১২৩৬ খৃঃ একজন শিয়া মুসলমান মোহাম্মদ ঘোরীকে রাজনৈতিক স্বার্থে কতল করেছিল। জালালুদ্দীন ফিরোজ শাহ একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন। তাঁকে তার জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীন খলজী রাজনৈতিক স্বার্থে কতল করে গদী দখল করেছিল। ১৫২৬ খৃঃ পাঠান সম্রাট ইবরাহীম লোদীকে নিহতের পর তাঁর ভ্রাতা মাহমুদ লোদীকে আফগানরা সুলতান বলে ঘোষণা করে একটা স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিল। বাবর একলক্ষ সৈন্য দিয়ে এই স্বাধীন রাজ্যকে খতম করে দিয়েছিল ও বহু আফগানকে শেষ করে দিয়েছিল। সম্রাট হুমায়ুনের সহিত সুলতান বাহাদুর শাহের, মাহমুদ লোদীর ও শের শাহের লড়াই কেবল রাজনৈতিক স্বার্থেই সংঘটিত হয়েছিল। হুমায়ুনের সহিত যুদ্ধ ছাড়াও শের শাহের সহিত সুলতান গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহের ও জালাল খানের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। সম্রাট আকবরের সাথে আদিল শাহ ও হিমুর লড়াই রাজনৈতিক স্বার্থেই সংঘটিত হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাথে তাঁর পুত্রের দুইবার লড়াই হলো। জাহাঙ্গীরের নির্দেশে শের আফগানের সাথে নবনিযুক্ত সুবাদার কুতুবুদ্দীনের লড়াই হলো বর্ধমানের বুকে, আর তাতে শের আফগাণকে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো। শাজাহানও তাঁর পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। জাহাঙ্গীরের প্রধান সেনাপতি মহব্বত খান জাহাঙ্গীরকে বন্দী করেছিল। শাহজাহান ও তাঁর ভ্রাতা শাহরিয়ার মধ্যে গদী নিয়ে বিরোধ বেধেছিল। শাহজাহানের জীবিতকালেই তাঁর চার পুত্র রাজ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি ও যুদ্ধ বিগ্রহ শুরু করে দিল। শাহজাহানকে রাজ্যহারা করে বন্দী করা হলো। সম্রাট আলমগীর ও ভাইদেরকে পরাজিত করে বাদশাহ হলেন। আলমগীরের পর রাজ্যে বহু সংঘর্ষ হয়। মোট কথা রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য মুসলমানেরা ঝগড়া বিবাদ ও লড়াই করে নিজেদের বহু ক্ষতি করেছে। গৃহ বিবাদের ফলে কত প্রতিভা যে ধ্বংস হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। দুঃখের বিষয়, এত সর্বনাশের পরেও আমাদের চৈতন্যোদয় হলো না। আজও মধ্য প্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর দিকে তাকালে

www.draminlibrary.com

বুক ফেটে যায়। সেখানে সংহতির অভাবেই মুসলমানরা মার খাচ্ছে। ভারতের মুসলিম সাম্রাজ্যের পতনের মূলে ছিল মুসলমানদের গৃহ বিবাদ। মুসলমানদের জাতীয় গৌরবের যে সূর্য্য ১১৭০ হিজরীর ৫ই শাওয়ালে ভাগীরথীর উপকূলে অস্তমিত হয়েছিল, তার মূলে ছিল আমাদের গৃহ বিবাদ ও গদীর মোহ। সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশে যে কয়েক লক্ষ মুসলমান মারা গেল, কয়েক হাজার গৃহ বিধ্বস্ত হলো, কয়েক হাজার দরকারী মানুষের পতন ঘটলো, শত শত কারখানা ও ইন্ডাষ্ট্রিজ আংশিক ও সামগ্রিক ক্ষতিসাধন হলো, হাজার হাজার শিশুকে এতিম করা হলো, হাজার হাজার নারীকে বিধবা করা হলো, বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও লাইব্রেরীর ক্ষতি সাধন করা হলো–এর কারণ কি? এর একমাত্র কারণ হলো, আমাদের রাজনৈতিক গৃহ বিবাদ। এতো করেও আমাদের জ্ঞান ফেরেনি। বিবাদের এখনো শেষ হয়নি। রক্ত নিয়ে হলি খেলা এখনো বন্ধ হয়নি। হত্যাকাণ্ড, লুটপাট ও নির্যাতন এখনো চলতেই আছে। রাজনৈতিক দাবারগুটি আমরা চালাতেই আছি। মাথা ধরলে মাথার ব্যথা কিভাবে সারবে–সে ব্যবস্থা করাটাই হলো বুদ্ধিমানের কাজ, মাথাটাকে কেটে ফেলে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কিন্তু আমাদের বুদ্ধি হলো মাথা কাটার বুদ্ধি। আমার প্রতিভাকে আপনি সহ্য করতে পারেন না, আর আমিও আপনার প্রতিভাকে সহ্য করতে পারি না। আমার নেতৃত্বে আপনি বিশ্বাসী নন আর আপনার নেতৃত্বে আমিও বিশ্বাসী নই। আমার মতের সহিত আপনি একমত হতে পারেন না, আর আপনার মতের সহিত আমিও একমত হতে পারি না। অতএব একে অপরের ঘাড়ে আর মাথা রাখবোই না। হায়রে গদীর মোহ। হায়রে দুনিয়ার স্বার্থ।

রাজনৈতিক দলাদলির অশুভ পরিণতির কিঞ্চিৎ আভাষ দিলাম। এবার ধর্মের নামে যে সব দল তৈরি হয়েছে সেসব দলের ঝগড়ার পরিণতি জানা দরকার।

বাগদাদের পতন

আপনারা বিশেষভাবে অবগত আছেন যে, আব্বাসী খলীফাদের রাজধানী ছিল বাগদাদ। এককালে জগতের সবচেয়ে বৃহৎ ও উন্নত নগরী হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিল এই বাগদাদ। যেদিন আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার কথা ভুলেও মানুষ মুখে আনতো না, যেদিন ইউরোপ অশিক্ষা ও কুশিক্ষার অন্ধকারে ডুবেছিল, সেদিন ধর্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, স্থাপত্য, আইন, বিচারালয়, চিন্তা ও গবেষণা

www.draminlibrary.com

প্রভৃতি মানব জীবনের সকল প্রকার চাহিদা মিটাতে বাগদাদের অবদান ছিল অতুলনীয়। সে যুগে বাগদাদের নিজামিয়া ইউনিভারসিটি ছিল দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ইউনিভারসিটি। আর বাগদাদের লাইব্রেরীই ছিল জগতের তুলনাহীন লাইব্রেরী। লক্ষ লক্ষ জ্ঞানপিপাসু পঙ্গপালের মত ছুটে যেতো শিক্ষা লাভের আশায় এই বাগদাদের ইউনিভারসিটিতে। যখন বাগদাদ গৌরবের সুউচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত ছিল, তখন সুন্দরী ও চিত্তাকর্ষক সে নগরীকে মুসলিম খলীফাদের উপযুক্ত রাজধানী বলেই মনে হতো। সে যুগে বাগদাদের যশো-গাথা আনোয়ারীর লেখনীতে চিরঞ্জীব হয়েছে ঃ

সুন্দরী বাগদাদ তুমি
জ্ঞানের আধার
জগতে নগরী নাহি
তুলিত তাহার
সৌন্দর্য্যে ঘেরা সে যে
নীলিমার তুলা
হাওয়া যেন বেহেশতের
প্রাণে দেয় দোলা।

কিন্তু ভুলেও সে বাগদাদের নাম আজ কেউ মুখে আনে না। কারণ, বাগদাদের সে গৌরব ও মহিমা আর নেই। সেখানকার ইউনিভারসিটি, গবেষণাগার ও বিরাট লাইব্রেরীর নাম নিশানা দুনিয়া থেকে মুছে গেছে। এহেন বাগদাদ নগরীর পতন কিভাবে ঘটলো। কার অপরাধে মুসলিম জাহানের চিন্তা, জ্ঞান, গবেষণা ও উন্নত জীবনের ভিত্তি নষ্ট হয়ে গেল? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমরা দেখতে পাবো মুসলমানদের মাযহাবী ঝগড়াই হচ্ছে এজন্য দায়ী। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, বাগদাদে একবার দু'বার নয়, কম সে কম আটবার মুসলমানদের মধ্যে হত্যাকাণ্ড হয়েছে। শেষবারে একদল অন্য দলকে জব্দ করার জন্য বাগদাদ ধ্বংসের পথকে সুপ্রশস্ত করে দিয়েছে। হালাকু খাঁ তার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত এই সুযোগকে পুরোপুরিভাবেই কাজে লাগিয়েছিল। এবার এক এক করে বাগদাদ ধ্বংসের ঘটনা উল্লেখ করবো।

প্রথম ঘটনা

প্রথম ঘটনা ঘটে হিজরী ৩১৭ সালে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত, 'মাকামে মাহমুদ' শব্দের অর্থ নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে ঝগড়ার সূত্রপাত হয়। শেষ পর্যন্ত এই ঝগড়া ব্যাপক আকার ধারণ করে। কাটাকাটি ও মারামারি করার ফলে

www.draminlibrary.com

হাজার হাজার লোক মারা যায়। ঐতিহাসিক আবুল ফিদা লিখেছেন, এই সংঘর্ষে কয়েক হাজার লোক প্রাণ হারিয়েছিল, তাদের মধ্যে আলিম ও বিদ্বান লোকের সংখ্যা অনেক ছিল।

দ্বিতীয় ঘটনা

দ্বিতীয় ঘটনার সূত্রপাত হয় হিজরী ৩২৩ সালে। ঐ সময় বাগদাদের খলীফা ছিলেন 'রাজিবিল্লাহ'। তিনি শাফিয়ী মাযহাবের লোক ছিলেন। এক দিনের ঘটনা, বাগদাদের মসজিদে দু'দল মুসলমানদের মধ্যে নামাযে 'বিসমিল্লাহ' পড়া নিয়ে ঝগড়া বেধে যায়। একদল বললো, যারা নামাযে উচ্চৈঃস্বরে বিসমিল্লাহ পড়বে না তাদেরকে ইমামতি করতে দেওয়া হবে না। অন্য দল বললো, যারা নামাযে চুপে চুপে বিসমিল্লাহ পড়বে না, আমরাও তাদেরকে ইমামতি করতে দিব না। আলিমগণ নিজ নিজ ফতোয়া জারী করতে লাগলেন। শেষে এই সামান্য ব্যাপারকে কেন্দ্র করে এমন ঝগড়া বেধে গেল যে, বাগদাদের জামে মসজিদ রক্তে লাল হয়ে গেল। খলীফা রাজিবিল্লাহ যখন এ সংবাদ শুনলেন, তখন তিনি নামাযে চুপে চুপে বিসমিল্লাহ পড়ার পক্ষপাতি যারা, তাদেরকে উচ্চৈঃস্বরে 'বিসমিল্লাহ' পড়ার জন্য কঠোর আদেশ দিয়ে দিলেন। আর বললেন, তোমরা যদি আমার এ আদেশ অমান্য কর, তাহলে তোমাদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেবো ও তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করবো। কিন্তু নামাযে চুপে চুপে বিসমিল্লাহ পড়ার পক্ষপাতী যারা, তারা খলীফার এ আদেশ কোন ক্রমেই মেনে নিতে পারেনি। ঐতিহাসিক আবুল ফিদা লিখেছেন, দীর্ঘ সাত বছর যাবত এ ঝগড়া স্থায়ী ছিল। শেষে একদিন খলীফা ভীষণভাবে রাগান্বিত হয়ে পুলিশের বড় কর্তাকে হুকুম দিয়ে দিলেন যে, যারা আমার আদেশ অমান্য করেছে তাদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দাও আর তাদেরকে একেবারে শেষ করে দাও। পুলিশের বড় কর্তা তাই শুরু করে দিল। এতে বিপুল সংখ্যক ঘরবাড়ী পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেলো ও বহু মুসলমান নির্মমভাবে মারা পড়লো।

তৃতীয় ঘটনা

বাগদাদের তৃতীয় ঘটনা ঘটে ৩৯৮ হিজরীতে। শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে শরীয়তের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতভেদ হতে থাকে। শেষে শিয়ারা সুন্নীদেরকে আর সুন্নীরা শিয়াদেরকে কাফির বলে ফতোয়া জারী করতে লাগলো। অবশেষে শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে গেলো। ঐতিহাসিক যুহরী বলেন, এই সংঘর্ষ বিপুল সংখ্যক মুসলমান প্রাণ হারিয়েছিল।

www.draminlibrary.com

চতুর্থ ঘটনা

বাগদাদের চতুর্থ ঘটনা ঘটে ৪৪৮ হিজরীতে। এই ঘটনার জন্য সুবিখ্যাত আলিম ইমাম কুশয়রীকে দায়ী করা চলে। তিনি একজন আশাএরা মতবাদের লোক ছিলেন। ঐতিহাসিক ইবনু খল্লকান বলেছেন, ইমাম কুশয়রী বাগদাদে যেয়ে আকিদা সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে হাম্বলী মাযহাবের লোকদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ শুরু করে দিলেন। পরে এই ঝগড়া দাঙ্গায় রূপ নিলো। এই দাঙ্গায় কয়েক হাজার মুসলমান প্রাণ হারিয়েছিল।

পঞ্চম ঘটনা

বাগদাদের পঞ্চম ঘটনা ঘটে ৪৮৩ হিজরীতে। এ ঝগড়া বাধে শিয়া আর সুন্নী মুসলমানদের মধ্যে। শিয়ারা সুন্নীদেরকে আর সুন্নীরা শিয়াদেরকে কাফির, ফাসিক, মুনাফিক ও বিভ্রান্ত বলে গালিগালাজ করতে থাকে। এর ফলে উভয় পক্ষে তুমুল লড়াই বেধে যায়। হয় মরবো–না হয় মারবো, এই পণ করে দু'দলই সমর ক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক যুহরী বলেছেন, এই যুদ্ধে উভয় পক্ষে বহু সংখ্যক মুসলমান মারা পড়ে। শাসন কর্তৃপক্ষ বহু চেষ্টা করেও অবস্থা আয়ত্বে আনতে পারেননি।

ষষ্ঠ ঘটনা

বাগদাদের ষষ্ঠ ঘটনা ঘটে ৫৮২ হিজরীতে। মহরমের সময় তাজিয়া নিয়ে মানত করতে করতে শিয়ারা জোরে জোরে হযরত আবু বকর, হযর উমর ও হযরত উসমানের মত জবরদস্ত সাহাবায়ে কেরামকে গালাগালি দিতে থাকে। সুন্নী মুসলমানেরা এই বেআদবী সহ্য করতে না পেরে শিয়াদের উপর আক্রমণ চালায়। ফলে শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে এক ভয়াবহ যুদ্ধ বেধে যায়। ঐতিহাসিক ইয়াফেয়ী বলেছেন, এই ভয়াবহ যুদ্ধে বিপুল সংখ্যক মুসলমানের প্রাণহানি ঘটে।

সপ্তম ঘটনা

বাগদাদের সপ্তম ঘটনা ঘটে ৫৮৭ হিজরীতে। আকিদা সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে দু'মাযহাবের মুসলমানদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হতে থাকে। পরে ইহা দাঙ্গার রূপ নেয়। ঐতিহাসিক ইয়াফেয়ী বলেন, এ যুদ্ধে অনেক মুসলমানের জান ও মালের ক্ষতি হয়েছিল।

অষ্টম ঘটনা

অষ্টম ঘটনা ঘটে ৬৫৬ হিজরীতে। তারপর আর বাগদাদে কোন কাণ্ড ঘটেনি। কারণ, ঝগড়া সৃষ্টির জন্য কোন মুসলমানই তখন বাগদাদে জীবিত ছিল

www.draminlibrary.com

না। এই মর্মান্তিক ঘটনার সূত্রপাত হয় তুশ্ শহর থেকে। ইসলামে খুঁটিনাটি বিষয়ের ব্যাখ্যা নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে ঝগড়া-লড়াইয়ের সৃষ্টি হয়। তখন তুশ্ শহরের একদল মুসলমান হালাকু খাঁর শরণাপন্ন হলো। চেঙ্গিস খাঁর পৌত্র হালাকু খাঁ তখন চীনের মঙ্গোলিয়ায় রাজত্ব করছিল। সে ছিল নাস্তিক তাতারীদের সম্রাট। এই মাযহাবের মুসলমানেরা তাকে যেয়ে বললো, হে সম্রাট হালাকু! আমাদের জাত ভাইরা আমাদেরকে মারছে। আমরা আপনার আশ্রয় ভিক্ষা চাই। আপনি যদি এই বিপদ হতে আমাদেরকে রক্ষা করতে পারেন, তাহলে আমরা আপনার চির অনুগত হয়ে থাকবো। হালাকু খাঁ তখন মুসলিম সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধনের স্বপ্ন দেখছিল। সে দেখলো এ আমার সুবর্ণ সুযোগ। তাই কাল-বিলম্ব না করে বিপুল সংখ্যক তাতারী সৈন্য নিয়ে তুশ্ শহরে আক্রমণ করলো। হালাকুর একমাত্র ইচ্ছা ছিল মুসলমানদের সর্বনাশ করা। কাজেই যারা ডেকে এনেছিল, এবং যাদের জন্য ডেকেছিল, দলমত নির্বিশেষে কোন মুসলমানকেই ছাড়লো না। সকলকেই শেষ করে দিল।

হালাকু খাঁ তুশ্ শহরকে শ্মশানে পরিণত করে বাগদাদের দিকে অগ্রসর হলো। তাতারী সৈন্য দু'ভাগে ভাগ হয়ে দু'দিক দিয়ে আক্রমণ করলো। মুসলিম জাহানের খলিফা মুস্তাসিম বিল্লাহ্ বাগদাদের রাজধানী থেকে বের হয়ে সন্ধির জন্য খুবই অনুনয় বিনয় করেছিলেন। হালাকু খাঁ তা শুনেনি। শেষে খলিফা প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছিলেন, হালাকু খাঁ তাও শুনেনি। যুহ্রী, ইবনে কাসীর, ইবনুল ইমাদ, সুয়ূতী, ইবনে খালদুন প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ বলেন, হালাকু খাঁ মুসলিম জাহানের প্রিয় খলিফা মুসতাসিম বিল্লাহ্কে চটের বস্তায় পুরে প্রখর রৌদ্রে ফেলে রেখেছিল। শেষে লাথি মেরে ও কুঠার দিয়ে আঘাত করে পৈশাচিকভাবে হত্যা করেছিল। খলিফার দুই পুত্র ছিলেন। একজনের নাম আমীর আবু বকর, অপরজনের নাম আমীর আবুল ফাজায়েল, হালাকু খাঁ এই দুই পুত্রকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। খলিফার তিন কন্যাকে ও কয়েক হাজার সম্ভ্রান্ত মুসলিম মহিলাকে হালাকু খাঁ দাসীতে পরিণত করেছিল। ঐতিহাসিক ইবনুল ইমাদ লিখেছেন, বাগদাদে চল্লিশ দিন হত্যাকাণ্ড চালিয়ে চল্লিশ লক্ষ মুসলমানকে হালাকু খাঁ হত্যা করেছিল।

ইবনে কাসীর লিখেছেন, হালাকু খাঁর সৈন্যরা স্ত্রী, পুরুষ, যুবক, শিশু ও বৃদ্ধ নির্বিশেষে কাউকে ছাড়েনি, সকলকেই মেরে শেষ করেছিল। যারা দরজা বন্ধ করে ঘরের কোণে লুকিয়ে ছিল, দরজা ভেঙ্গে ও ঘরে আগুন লাগিয়ে তাদেরকে মর্মান্তিকভাবে মারা হয়েছিল। দ্বিতল, ত্রিতল দালানের উপর তলার নালি দিয়ে

www.draminlibrary.com

রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছিল। হালাকু খাঁর সৈন্যরা হযরত আব্বাসের বংশধরদেরকে গরু ছাগলের মত জবাই করেছিল। পথে ঘাটে নরপশু হালাকুর সৈন্যরা সম্ভ্রান্ত মুসলিম মহিলাদের উপর বলাৎকার করেছিল। হাজার হাজার আলিম, ফকীহ, মুহাদ্দিস, হাফিয, ক্বারী, ইমাম, খতিব, মুন্সী, মুফতী, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, চিকিৎসক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। সমস্ত নগরকে আগুনে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছিল। মসজিদ, মাদ্রাসা, কলেজ, খানকাহ বলে কিছুই ছিল না। বাগদাদের নিজামিয়া ইউনিভার্সিটি ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। হালাকু খাঁ তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিল। পাটনার খোদা বখ্শ লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা খোদা বখ্শ সাহেব বলেছেন, সাতশত বছর ধরে বাগদাদে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অমূল্য গ্রন্থরাজির ভাণ্ডার সঞ্চিত হয়েছিল, অত বড় লাইব্রেরী আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে তৈরি হয়নি আর হবে কি না সন্দেহ। আফসোস শত আফসোস; পৃথিবীর সেই অতুলনীয় লাইব্রেরীকে হালাকু খাঁ টাইগ্রীসের বুকে ডুবিয়ে দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। বাগদাদের লাইব্রেরীতে এক বৃদ্ধ লাইব্রেরীয়ান ছিলেন। তিনি এই দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে রাজপথে দাঁড়িয়ে বুক চাপড়াতে লাগলেন আর আফসোস করে বলতে লাগলেন হায় হায়; মুসলিম জাতির কি সর্বনাশই না হলো, যে অমূল্য সম্পদ আজ টাইগ্রীসের স্রোতে ভেসে গেলো, মুসলমানেরা কোন দিন এ সম্পদ আর ফিরে পাবে না। এই বলতে বলতে বৃদ্ধ লাইব্রেরীয়ান হার্টফেল করে সেখানেই মারা গেলেন। ইবনে কাসীর লিখেছেন, সবই যখন শেষ হয়ে গেল তখন ইসলাম জগতের কেন্দ্রস্থল বাগদাদ নগরীকে দেখে বিরাণ মনে হচ্ছিল। পথে ঘাটে কেবল লাশ আর লাশ। চল্লিশ লক্ষ লাশ যখন গলে-পচে দুর্গন্ধময় হয়ে উঠলো, তখন সমগ্র এলাকার আবহাওয়া বিষাক্ত হয়ে গেল। ইরাক ও শামের অধিবাসীরা একসঙ্গে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে পড়লো।

প্রফেসার ব্রাউন লিখেছেন, হালাকু খাঁ মুসলমানদের যে সর্বনাশ করেছে, পরবর্তীকালে তার আর কখনো পূরণ হয়নি। এই ক্ষতির বিবরণ দেওয়া একেবারে অসম্ভব। কেবল যে লাইব্রেরী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়েছিল তাই নয়, বহু সংখ্যক বিদ্বান ব্যক্তিকে মেরে দেওয়ার ফলে মুসলমানদের মৌলিক গবেষণার পথ বন্ধ হয়ে গেল। পৃথিবীর ইতিহাসে এত বড় মহান সভ্যতাকে এত তাড়াতাড়ি আগুনে পুড়িয়ে ও রক্ত-সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়ার দৃষ্টান্ত নেই। বাগদাদের এই ধ্বংসলীলায় মর্মাহত হয়ে বাগদাদের নিজামিয়া ইউনির্ভাসিটির এক পুরাতন ছাত্র মহাকবি শেখ সাদী লিখেছেন ঃ

www.draminlibrary.com

আসমানের আজ উচিত ছিল
জমিনে রুধির বর্ষণ করা।
কারণ, আমিরুল মুমিনীন মুসতাসিমের
সাম্রাজ্য আজ মিসমার হয়ে গেলো।
হায় মুহাম্মদ (সঃ) তুমি কি রোজ
কিয়ামতে মাথা তুলবে?
তবে আজই তুলো
সৃষ্টি লোকের কিয়ামত দেখে নাও।

সাড়ে ছয়শত বছর পর আল্লামা ইকবালও বাগদাদ ধ্বংসের মর্সিয়া এভাবে গেয়েছেন ঃ

এক জামানার জাগ্রত জীবন–
আজও আমার প্রাণে আন্‌ছে আলোড়ন।
বলবে তুমি পুড়ে গেছে উহা
কিন্তু স্মৃতি যে অমর। হয় কি কভু বিস্মরণ?
মুসলিম সভ্যতার জিয়ারত গাহে যাও যদি কভু
দেখবে সেথায় বাগদাদ নগরী চির মহীয়ান।
ছিল সেথায় কর্ম জীবনের নাজ (নাচ)
কিন্তু দ্রষ্টা বিহীন আজ।
ইতিহাস অরণ্য মাঝে প্রস্ফুটিত পুষ্প
এই তাহ্‌জীবে হেজাজ।
এর পাক ধূলিকণা আজও জীবন সন্ধানী
আত্মসমাহিত-বুকে আছে নবী উম্মতের পদ-ধ্বনি।
কি করে লিখি আমি এঁদের কাহিনী
সংক্ষেপে বলি-কবর তাঁদের
যাঁদের ভয়ে কাঁপিত রোমক বাহিনী।

www.draminlibrary.com

কেবল বাগদাদে নয়

হালাকু খাঁ কেবল বাগদাদ ও তুশ্ শহর ধ্বংস করেই ক্ষান্ত হয়নি। মুসলমানদের গৃহযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে সে সমরখন্দ, বুখারা, খোয়ার্জম, রয়, নাসা, হমদান, আজার বাইজান, দরবন্দ, শিরোয়ান, কজবিন, তবরেজ, মরাগান, মবাগা, আরবল, সলফান, তিরমিজ, বলখ, হিরাত, নেশাপুর, বাবীয়ান, কপচাপে, কুম, কাশান, তুরিজ, ইস্পাহান; মার্দীন, মসুল, দকুকা দেয়ারেবকরের, নসিবয়েন, সঞ্জার, বিরা' হলব ও ইউরোপের বহু অংশের উপর ভীষণ আক্রমণ চালিয়েছিল। হালাকু খাঁ খোয়ার্জমের বারলক্ষ মুসলমানকে কতল করেছিল। বিখ্যাত সাধক নাজিমুদ্দীন কুবরাকেও নরপশু হালাকু ছাড়েনি। হালাকু খাঁ বাবিয়ান নগরীতে এত অত্যাচার করেছিল যে, একশত বছর পর্যন্ত সেখানে ঘাস জন্মায়নি। গজবে-ইলাহিতে মাটির রং বিগড়ে গিয়েছিল; নেশাপুরে যাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল, তাদের মাথা কেটে নেওয়া হয়েছিল। তারপর ছোট ছেলেমেয়েদেরকে মাথার খুলি দিয়ে একটি পিরামিড, বয়স্ক পুরুষদের মাথার খুলি দিয়ে একটি পিরাামিড ও মেয়েদের মাথার খুলি দিয়ে একটি পিরামিড–এ রকম পৃথক পৃথকভাবে তিনটি পিরামিড তৈরি করা হয়েছিল।

বন্ধুগণ! এ পর্যন্ত আমাদের সর্বনাশের যে বিবরণ পেশ করা হলো–এর মূলে রয়েছে আমাদের গৃহ বিবাদ। শত্রুর কাজই হতো ক্ষতি ও ধ্বংস সাধন করা, কাজেই কেবল হালাকু খাঁকে দোষ দিলেই চলবে না। দোষ মুসলমানদের। গৃহ-বিবাদ করে একদল যদি অন্যদলের বিরুদ্ধে তাকে ডেকে না নিয়ে আসতো তাহলে মুসলমান জাতির চরম পতন ঘটতো না। ছোট বেলায় একটা গল্প পড়েছিলাম, এক কাঠুরে কুড়াল দিয়ে একটি গাছ কাটছিল। গাছ বললো, হে ভাই কুড়াল তুই জাতিতে লোহা আর আমি হচ্ছি গাছ। আমি তো তোর কোনদিন ক্ষতি করিনি। তবে তুই আমাকে এভাবে কাটছিস কেন? কুড়াল তখন বললো, এই যে আমার পিছনে একটি বাঁট লাগানো রয়েছে, এটা তোমারই জাত-ভাই। ও যদি আমাকে শক্তি না যোগাতো; তাহলে আমি একা কখনই তোমাকে কাটতে পারতাম না। তোমার স্বজাতি হয়ে এই বাঁট তোমাকে কাটার জন্য আমাকে ভীষণভাবে চাপ দিচ্ছে, তাই আমি তোমাকে কাটছি।

বলাবাহুল্য, উপরোক্ত গল্পের সাথে মুসলমানদের কার্যকলাপের চমৎকার মিল রয়েছে। মুসলমানরা যদি আপোষে গৃহবিবাদ করে একদল অন্য দলকে জব্দ করার জন্য খাল কেটে কুমীর না আনতো–তাহলে এ সর্বনাশ কখনই ঘটতো না। এত বড় আঘাতের পর এত বড় দুর্ঘটনার পর আমাদের এখনও জ্ঞান ফেরেনি। যে জাতি এত কাণ্ড জ্ঞানহীন, যে জাতি এত অপরিণামদর্শী, আমার বিবেচনায় 'লর্ড বার্নাড্‌শ' তাদেরকে নিকৃষ্ট বলে একটা কাবীরা গুনাহ করেননি।

www.draminlibrary.com

আমরা কিছুটা হিন্দু হয়ে পড়েছি

তারপর আমাদের জীবনের একটা মস্ত বড় কলঙ্ক হলো এই যে, আমরা আর ষোলআনা মুসলমান নই। বেশ খানিকটা হিন্দু হয়ে পড়েছি। লক্ষ কোটি প্রতিমা অধ্যুষিত তেত্রিশ কোটি দেবতা অধ্যুষিত ও ত্রিশ কোটি বৈদান্তিক অধ্যুষিত এই দেশে যখন ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল, তখন শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে লক্ষ লক্ষ হিন্দু নরনারী ইসলাম ধর্ম কবুল করে মুসলমান হয়েছিল। আমার মনে হয় অধিকাংশ নওমুসলিম নরনারীর মধ্যে মুশরিকানা জাহেলিয়াতের বীজানু বিদ্যমান ছিল। আর বহিরাগত মুসলমানদের সাথে তাদের বৈবাহিত সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার ফলে তাদর সন্তান-সন্ততিদের অনেকেই প্রকৃতিগতভাবে শঙ্কর জাতীয় হয়ে পড়েছিল। এভাবে 'না ইল্লাল্লাজী'– 'না উল্লাল্লাজী' এ ধরনের এক ঘোলাটে অবস্থার মধ্যে পড়ে এদেশের অধিকাংশ মুসলমান। আমরা কালক্রমে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা হতে দূর সরে পড়লাম। হিন্দুদেরকে কাল্পনিক বস্তুর পূজা করতে দেখে আমরাও পাঁচপীর, তেনাপীর, ঢেলাপীর, ঘোড়াপীর, কুমীরপীর প্রভৃতির পূজা শুরু করে দিলাম। হিন্দুদেরকে ঠাকুর দেবতার থানে পাঁঠা বলি দিতে দেখে আমরাও পীরের দরগায় মোরগ খাসি মানত করতে শুরু করে দিলাম। ওদেরকে ঠাকুর থানে আতপ চা'ল, কলা দিতে দেখে আমরাও শিরনি, ফিরনি, পোলাও, খিচুরী দিতে শুরু করে দিলাম। কবির ভাষায়–

তওহীদের হায় এ চির সেবক
ভুলিয়া গিয়াছি সে তকবীর,
দুর্গানামের কাছাকাছি প্রায়
দর্গায় গিয়া লুটাই শির।
ওদের যেমন রাম নারায়ণ
মোদেরও তেমনি মানিক পীর,
ওদের চাউল ও কলার সঙ্গে
মিশিয়া গিয়াছে মোদের ক্ষীর।
ওদের শিব ও শিবানীর সাথে
আলি ফাতেমার মিতালী বেশ,
হাসানে করেছি কার্ত্তিক আর

www.draminlibrary.com

হোসেনে করেছি গজগনেশ।
কেউবা হইল গজানন মিয়া
হারাধন খাঁ ও রাবন শেখ,
সীতা বিবি আর ভগবতী বিবি
হেন বিবিগণও হলো অনেক।

মোল্লা আবদুল কাদের বদায়ুনী তাঁর ইতিহাসে লিখেছেন, সম্রাট আকবর এভাবে হিন্দু প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছিল যে, প্রত্যেকদিন সূর্যের এক হাজার এক নাম জপ করতো, কপালে তিলক ফোটা কাটতো, উপবীত ধারণ করতো, গরু ও ছাগলের পূজা করতো, সালামের পরিবর্তে মাটি চুম্বনের প্রথা চালু করেছিল। মদ্যপান করতো ও মদ্যপান করার জন্য জনগণকে উৎসাহ দিত। স্ত্রী সহবাসের গোসল আর খতনার প্রথা বন্ধ করে দিয়েছিল। আকবর পর্দা ও হিজাব তুলে দিয়েছিল। গরু কুরবানী বন্ধ করে দিয়েছিল। আকবরের ভক্তরাও এসব প্রথা ব্যাপকভাবে চালু করে দিয়েছিল। দারাশিকো হিন্দু যোগী সন্ন্যাসীদের সাহচর্যে অবস্থান করতো। সে বেদান্ত দর্শনের অনুরাগী ছিল। বেদান্ত দর্শনের সাথে অতীন্দ্রিয় সুফী-মরমীবাদের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। হিন্দু যোগীদের বই পুস্তকের অনুবাদ করেছিল। উপনিষদ, ভগবতগীতা, যোগবশিষ্ট রামায়ন প্রভৃতি হিন্দু ধর্ম পুস্তকের ফারসীতে তরজমা করে প্রচার করেছিল। হিন্দু প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে দরাফ খাঁ গঙ্গাস্তোত্র রচনা করেছিল। কবি কায়কোবাদ তাঁর মহাকাব্য মহাশ্মশানে কালীবন্দনা রচনা করেছেন। কবি নজরুল ইসলাম শ্যামা সঙ্গীত গেয়েছেন। মোট কথা, আমাদের বহু রাজা বাদশাহ ও কবি সাহিত্যিক হিন্দু সংস্কৃতির জয়গানে আত্মহারা হয়ে গিয়েছেন।

হিন্দু ধর্ম মতে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হতে, ক্ষত্রিয় ব্রহ্মার বাহু হতে, বৈশ্য ব্রহ্মার উরু হতে আর শূদ্র ব্রহ্মার চরণ হতে উৎপন্ন হয়েছেন। এছাড়া অন্যান্য জাতি ম্লেচ্ছ। শূদ্র চরণ হতে উৎপন্ন বলে বৈশ্যের চেয়ে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ, আর ক্ষত্রিয় বাহু হতে উৎপন্ন বলে ক্ষত্রিয়ের চেয়ে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ–অর্থাৎ ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠতম। আবার হিন্দু সমাজে দেখা যায় এই বর্ণ চতুষ্টয় নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। সামাজিক প্রথা ও দেশাচার প্রভৃতি নানা কারণে এই সকল শ্রেণী অনেক স্থলে অন্নগ্রহণ বা কন্যা আদান প্রদান করেন না। ইসলাম ধর্মে এই জাতিভেদ প্রথা নেই। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'–এই কালেমা যার অন্তরে বিরাজ করছে, ইসলামের নীতি যে মেনে চলে, সে মুসলমান। সে যে কোন বংশে আর যে কোন দেশে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, তাতে কিছু যায় আসে না। কবির ভাষায় ঃ

www.draminlibrary.com

আরাবী, আজামী, সৈয়দ, পাঠান, কাযী ও খন্দকার
জোলা, চাষী, কলু, নিকারী, কামার অথবা চর্মকার,
যে যাহাই হও মুসলিম কি না একথা জানিতে চাই,
মুসলিম যদি এসো মোর বুকে তুমি যে আমার ভাই।

একজন মুসলমান যে কোন মুসলমানের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পারে। যোগ্যতা থাকলে সামনে দাঁড়িয়ে ইমামতি করতে পারবে। অন্নগ্রহণ করতে বা তার সাথে কন্যা আদান প্রদান করতে ইসলাম ধর্মে কোন বাধা নেই।

কিন্তু হিন্দুর জাতিভেদ প্রথা আমাদের মাঝে আজ ক্রিয়াশীল। হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ বর্ণ শ্রেষ্ঠ বলে যেমন কৌলিণ্যের বড়াই করে থাকে। ঠিক তেমনি হিন্দুর দেখাদেখি আমাদের সমাজেও একটি শ্রেণী কৌলিণ্যের আস্ফালন করে থাকে। এদের মধ্যে কেউ নিগুণ, কদাচারী, লম্পট, অভদ্র, মিথ্যুক, কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়েও শরীফ অর্থাৎ অভিজাত। আর অপর কেউ গুণী, সত্যবাদী, ভদ্র, বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হয়েও রজীল অর্থাৎ ঘৃণ্য। মেলা-মেশা, খাওয়া-দাওয়া, লেন-দেন ও বিবাহ-শাদীর ব্যাপারে এই তথাকথিত শরীফের দল সমাজের এক বড় অংশকে ঘৃণা করে থাকে। এটা আমাদের জাতীয় জীবনের এক মহাকলঙ্ক ছাড়া আর কিছু না।

ইসলাম ধর্মে অদ্বৈতবাদ বা অভিন্নবাদের স্থান নেই। পবিত্র কুরআন ঘোষণা করছে, 'আল্লাহুস্ সামাদ'। সামাদ ঐ সত্তাকে বলা হয়, যে সত্তা ফুটো নয়, ফাঁপা নয়–যে সত্তা হতে কোন সত্তা নির্গত হয়নি আর যে সত্তায় কোন সত্তা মিশতে পারে না। সৃষ্টি হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, নিশ্চিত অস্তিত্ব, 'সলিড', মজবুত ও দৃঢ় যে সত্তা–সেই সত্তার নাম আল্লাহ। আল্লাহ চিরন্তন আর সৃষ্টি নবোদ্ভূত। আল্লাহর লয় নেই, ক্ষয় নেই, বিনাশ নেই, বিধ্বস্তি নেই। কিন্তু নবোদ্ভূতের লয় ক্ষয় ও বিনাশ-বিধ্বস্তি আছে। কাজেই চিরন্তন কখনো নবোদ্ভূত হতে পারে না। লেখা ও লেখক, চিত্র ও চিত্রকর; কবি ও কাব্য, শিল্প ও শিল্পী, কর্তা ও কর্ম যেমন এক জিনিস নয়, ঠিক তেমনি সৃষ্টি ও স্রষ্টা কখনো অভিন্ন হতে পারে না।

কিন্তু হিন্দু সমাজ অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী। শ্রীমত শংকরাচার্য্য এই মতবাদ প্রচার করেছেন। এই মতবাদের মূল কথা হলো সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা অভিন্ন বস্তু। বিশ্ব চরাচরে যা কিছু রয়েছে সবই স্রষ্টার অংশ বিশেষ। অতএব যারই পূজা করা যাক–স্রষ্টার পূজাই করা হবে। তাই দেখা যায় হিন্দু জাতি প্রতিটি দৃশ্যমান বস্তুকে নারায়ণ বা হরি নামে অভিহিত করে থাকেন। পুষ্করিণীর পানিতে পদ্ম পাতার উপর ব্যাঙ বসেছিল, হঠাৎ একটা সাপকে দেখে ব্যাঙ পানিতে লুকিয়ে পড়লো, তাই দেখে হিন্দু কবি রচনা করলেন ঃ

www.draminlibrary.com

হরির উপরে হরি হরি শোভা পায়
হরিকে দেখিয়া হরি হরিতে লুকায়।

১৯৫৯ সালের একটা ঘটনা মনে পড়ে। আমার লেখা ও সৈয়দ বদরুদ্দোজার ভূমিকা সম্বলিত 'সত্যের আলো' নামক পুস্তকটিতে ভারত সরকার বাজেয়াপ্ত করে দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে কাটোয়ার আদালতে একটি মামলা দায়ের করেছিল। কাটোয়া বর্ধমান জেলার অন্তর্গত একটি মহকুমা টাউন এবং উহা গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। একদিন আদালত হতে বাড়ী ফিরার জন্য বিকাল পাঁচটার বাসে চেপেছি, এমন সময় দেখি কয়েকজন হিন্দু মহিলা গঙ্গাস্নান সেরে এসে বাসে উঠলেন। সকলেই গঙ্গাজলের কলসীগুলোকে সযত্নে বসিয়ে রাখলেন। নিজেরাও আপন আপন সিটে বসে পড়লেন। দেখলাম একটি মেয়ে বসার সিট পাননি। তিনি তাঁর শিশু সন্তানটিকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। আমরা একটু অন্যমনস্ক হয়ে আছি। এমন সময় শুনি মেয়েদের মধ্যে হৈ চৈ। কি হলো? ব্যাপার কি? পাশের এক ভদ্রলোক বললেন, ব্যাপার খুবই গুরুতর, কোলের সন্তানটি প্রস্রাব করেছে আর তা গঙ্গাজলের কলসীতে পড়েছে। মহিলাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধা ছিলেন। তিনি হঙ্কার ছেড়ে বললেন, শাস্ত্রের কোন খবর না রেখে এত তোরা চিল্লাস্ কেন? জানিস্ না ছেলের 'মুত' নারায়ণ! আমিও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধার কথায় সমর্থন দিয়ে বললাম, বুড়ি মা! ঠিকই বলেছেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদের মানেই তাই। মেয়েটি নারায়ণ, ছেলেটি নারায়ণ, ছেলের 'মুত' নারায়ণ, নারায়ণ পড়ে মিশে গেলো নারায়ণের সাথে আর পান করবে নররূপী নারায়ণে– অতএব কোন দোষ নেই। তারপর মনে মনে একটা কবিতা আওড়াতে শুরু করলাম ঃ

হরির কোলেতে হরি হরি শোভা পায়
গড়ায়ে পড়িল হরি, হরিতে মিশিল হরি
পান যদি করে হরি কিবা ক্ষতি তায়?

কিছুক্ষণ পরে মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম, আমরাও তো এ ব্যাপারে হিন্দু হয়ে পড়েছি। আমাদের অনেকেই তো শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী, মহিউদ্দীন ইবনুল আরাবীর মত পণ্ডিতকে অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী হয়ে তা প্রচার করতে দেখা গেছে। অনেকে তো মানুষ মুহাম্মদ (সঃ) ও আল্লাহর মধ্যে কোন তফাৎই খুঁজে পাননি। তারা বলেন ঃ

আকার কি নিরাকার সেই রব্বানা
আহমাদ আহাদ বিচার হলে যায় জানা
আহমাদ নামেতে দেখি

www.draminlibrary.com

মিম হরফে লেখেন নবী
মিম গেলে আহাদ বাকী
আহমাদ নাম থাকে না।
যখন সাঁই নৈরাকারে
ভেসেছিল ডিম্ব ওরে
আহাদে মিম বসায়ে
আহমাদ নাম হলো সেনা।
জনৈক মুসলমান কবি বলেন ঃ
আহমদের ঐ 'মিম'-এর পর্দা
উঠিয়ে দেরে মন
দেখবি সেথা বিরাজ করে
আহাদ নিরঞ্জন।

দীন ও দুনিয়া নামক উর্দ্দু পুস্তকের মীলাদ অধ্যায়ে দেখা যায় আর অধিকাংশ মীলাদের মাহফিলে পঠিত হয়ে থাকে ঃ

মোহাম্মদ সির্‌রে কুদ্‌রাত হ্যায়
কোয়ী রম্‌য্‌ উস্‌কী কিয়া জানে
শরীয়ত মে তো নবী হ্যায়
হকিকত্‌ মে খোদা জানে
হুয়াল্‌ আওয়াল্‌ হুয়াল্‌ আখের
হুয়ায্‌ যাহের হুয়াল্‌ বাতেন ..... ইত্যাদি।

অর্থাৎ মুহাম্মদ (সঃ) কুদরতের গুপ্ত রহস্য কে তার বুঝবে ভেদ। শরীয়তে তিনি নবী, হকিকতে যে কি তা খোদা জানেন। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনি প্রকাশ্য, তিনিই গুপ্ত ..... ইত্যাদি। অনেকে প্রচার করে থাকে যে, আল্লাহর নূরে নবীর পয়দা আর নবীর নূরে সারা জাহান পয়দা। অর্থাৎ কি না সারাজাহানে যা কিছু আছে সবই সেই আল্লাহরই অংশ বিশেষ। অথচ পবিত্র কুরআন ঘোষণা করছে ঃ কুল ইন্নামা আনা বাশারুম মিস্‌লুকুম ইউহা ইলাইয়্যা আন্নামা ইলাহুকুম্‌ ইলাহুঁউ ওয়াহেদ।' হে রসূল মুহাম্মদ (সঃ) তুমি ঐ অদ্বৈতবাদীদেরকে বলে দাও যে, আমি আল্লাহ নই, আল্লাহর পুত্র নই, আল্লাহর অংশ বিশেষ নই, আল্লাহর সত্ত্বা হতে আমার সত্ত্বা নির্গত হয়নি; আমি তোমাদেরই মত মানুষ। আমার পেটের দাবী আছে, আমার নিদ্রার দাবী আছে, আমার যৌন ক্ষুধার দাবী আছে।

www.draminlibrary.com

তবে তোমাদের মধ্যে ও আমার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, আমার উপর পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। আমি সেই কুরআনের ধারক বাহক ও প্রচারক হয়ে তোমাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতে এসেছি। জেনে রেখো তোমাদের প্রভু–তিনি একক অদ্বিতীয় মহান আল্লাহ।

আবার মুসলমানদের কয়েকটি জামাআত মানুষকে ও আল্লাহকে একাকার করে দিয়ে গান গেয়ে বেড়ায় ঃ

মন পাগলরে গুরু ভজনা
গুরু বিনে মুক্তি পাবিনা।
গুরু নামে আছে সুধা
যিনি গুরু তিনিই খোদা
মন পাগলরে গুরু ভজনা।

তারপর আমাদের দেশে কুমীর পীরের আস্তানা, ঘোড়া পীরের আস্তানা, কচ্ছপ পীরের আস্তানা, ঢেলা পীরের আস্তানা ও তেনা পীরের আস্তানা গড়ে উঠলো কেমন করে? যদি বলা হয়, যারা শঙ্করাচার্য্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে কুমীররূপী নারায়ণে, ঘোড়ারূপী নারায়ণে, কচ্ছপরূপী নারায়ণে, ঢেলারূপী নারায়ণে ও তেনারূপী নারায়ণে বিশ্বাসী, তারাই ঐ আস্তানা গড়ে তুলেছে–তাহলে কি ভুল বলা হবে?

এবার সন্ন্যাসবাদের কথায় আসা যাক। ইসলামে সন্ন্যাসবাদের স্থান নেই। প্রিয় রসূল বলেছেন, 'লা রোহ্বানিয়াতা ফিল্ ইসলাম'। ইসলামে বৈরাগ্য নেই। কিন্তু হিন্দু সমাজের শ্রীচৈতন্য ও রামকৃষ্ণ পরম হংসের মত পণ্ডিতরা সন্ন্যাসবাদের প্রচার করেছেন। তাঁরা বলেছেন, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য–এই ষড়রিপুকে টুটি টিপে মেরে দাও। স্ত্রী পুত্র ও কলোত্রের মায়া ত্যাগ করে, ভূ-সম্পতি ও অট্টালিকার মোহ ছেড়ে দিয়ে গেরুয়া বসন পরিধান করে, ভিক্ষা পাত্র হাতে নিয়ে, হরিনামের মালা জপ্‌তে জপ্‌তে মঠে, মন্দিরে, বিহারে, তপোবনে, নদীর তীরে, পাহাড়ের গুহায়, গভীর অরণ্যে যেয়ে নির্বাণ তপস্যায় আত্মনিয়োগ করো, তবেই তুমি মোক্ষলাভ করবে।

ইসলাম বলে, 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিবে মুক্তির স্বাদ, বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে তোমার নয়'। যারা প্রকৃত মুসলমান হবে, তারা এই সংসারের মাঝে থেকেই মহান আল্লাহর আদেশ নিষেধ ঠিকভাবেই মেনে চলবে। তারা কখনই ভিক্ষা পাত্র হাতে নিয়ে বনে যেতে পারে না। তাছাড়া বনের মাঝে সন্ন্যাসী মহারাজকে ভিক্ষা দিবে কে? সবাই যদি বৈরাগী হয়ে লোকালয় ছেড়ে গভীর জঙ্গলে চলে যায়, তাহলে কি গভীর জঙ্গল হয়ে উঠবেনা লোকালয়? আর

www.draminlibrary.com

লোকালয় কি হয়ে উঠবেনা গভীর অরণ্য? তাহলে লাভ হলো কোথায়? সন্ন্যাসবাদে ষড়রিপু সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তাও যুক্তিহীন। কেননা আর্সেনিক, নাক্সভমিকা, একোনাইট, বেলেডোনা, ল্যাকেসিস, নাজা প্রভৃতি বিষজাতীয় দ্রব্যগুলির মধ্যে যেমন মারণশক্তি আছে, ঠিক তেমনি ওগুলির মধ্যে জীবনদায়িনী শক্তিও আছে। মেডিকেল গ্রাউন্ডে, ঠিকমত প্রয়োগ কৌশল ও ব্যবহার বিধি জেনে প্রয়োগ করতে পারলে ঐ বিষের দ্বারা অমৃতের ফল পাওয়া যায়। ইসলাম বলে তোমার মধ্যেও ঐরূপ বিষজাতীয় কয়েকটি জিনিস রয়েছে, সেগুলি হচ্ছে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। ওগুলি যেমন মানুষকে সর্বনাশের পথে নিয়ে যায়, ঠিক তেমনি প্রয়োগ কৌশল ও ব্যবহারবিধি জেনে ওগুলির প্রয়োগ করতে পারলে অমৃতের ফল পাওয়া যায়। তাই ঐ ষড়রিপুর প্রয়োগ কৌশল ও ব্যবহার বিধি দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম রূহানী চিকিৎসক নবী মুহাম্মদ (সঃ) শিক্ষা দিয়ে গেছেন। প্রতিটি মুসলমানকে সেভাবেই ওগুলির ব্যবহার করতে হবে। কেবল কাম রিপুর কথাটাই ধরা যাক, এই যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান–মক্তব, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, ইউনিভারসিটি; এই যে লোকালয়–গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর; এই যে অফিস-আদালত, আইন-শৃঙ্খলা; এই যে উপাসনালয়–মাসজিদ, মন্দির, গীর্জা– এ সবের মূল হচ্ছে 'কাম'। নর ও নারীর মধ্যে কাম প্রবৃত্তি না থাকলে কখনই তারা যৌন মিলনে আবদ্ধ হতো না। যে সকল সন্ন্যাসী ব্রত পালনের উপদেশ বিতরণ করে থাকেন, তাঁদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আচ্ছা বলুন তো, আপনাদের পিতা-মাতারা বিবাহ না করে বৈরাগী বৈরাগিনী হয়ে যদি সংসার ছেড়ে বনে চলে যেতেন, তাহলে আপনারা দুনিয়ায় আসতেন কেমন করে? এ প্রশ্নের উত্তর কি দিবেন? আর এক কথা, পৃথিবীতে যত লোক আমরা বাস করছি সবাই যদি আজ থেকে কাম রিপুকে এড়িয়ে বৈরাগী বৈরাগিনী হয়ে চলার ব্রত অবলম্বন করি, তাহলে এক দেড়শো বছর পর দুনিয়ার বুকে কোন মানুষ পাওয়া যাবে কি? কখনও না। সে জন্যই এই অবান্তর ও অযৌক্তিক নীতিকে ইসলাম সমর্থন করে না। মানব জীবনে কাম রিপুর মতই অন্যান্য রিপুর প্রয়োজন রয়েছে। তবে সেগুলিকে অবাধে চরিতার্থ করা চলবে না। পূর্বেই বলা হয়েছে, রসুল মুহাম্মদ (সঃ) যেভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে বলেছেন সেভাবেই ওগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

অতীব দুঃখের বিষয়, বৈরাগ্যের মত একটি অনৈসলামিক নীতি মুসলমানদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। নিমাই সন্ন্যাসীর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে বাউল ফকীর, ন্যাড়া, কীর্ত্তনীয়া, নাগর্দীয়া ও শাহজিয়ার দল তৈরি হয়েছে। কেবল তাই নয়, বৈরাগ্যের গোলক ধাঁধাঁয় পড়ে সংসার ছেড়ে না গেলেও বিপুল সংখ্যক মুসলমান বাস্তব জীবনের কর্ম সাধনা হতে দূরে সরে পড়েছে। মানব জীবনের

www.draminlibrary.com

বৃহত্তর ও মহত্তর প্রশ্নাবলীর দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করার, ধর্মের বিশ্বজনীন নীতি ও আদর্শকে বুঝবার, পরিবর্তিত যুগের সকল প্রয়োজনে দুনিয়ার নেতৃত্ব ও ইমামতের জন্য প্রস্তুত হওয়ার যোগ্যতা হতে তারা দূরে সরে পড়েছে।

বৈরাগ্য নীতিটাকে আমাদের একদল শাসক, ধনিক ও বণিক শ্রেণী একেবারে লুফে নিয়েছে। তারা হিন্দু প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে না স্বার্থান্ধ হয়ে জানি না, তবে অনবরত তাঁরা নসিহত ফরমিয়ে থাকেন যে, ধর্মের সাথে কর্মের কোন যোগাযোগ নেই। ধর্ম এক জিনিস আর কর্ম আর এক জিনিস। যারা ধর্ম করবে তারা ধর্মই করুক অর্থাৎ নামায পড়ুক, রোযা রাখুক, হাজ্জ করুক, যাকাত দিক, সুবহানাল্লাহ পড়ুক, যিকির-আযকার করুক। আর দেশ শাসনের জন্য, আইন প্রণয়ন ও মাল আমদানী রফতানীর জন্য আমরাই যথেষ্ট। কিন্তু এই মুসলমান ভদ্রলোকেরা জানেন না যে, ইসলামে 'ধর্মবিহীন কর্ম আর কর্মবিহীন ধর্ম'–মূল্যহীন। সূর্যের সাথে তার কিরণের যেমন সম্পর্ক, চন্দ্রের সাথে তার সুষমার যেমন সম্পর্ক, ফুলের সাথে তার সৌরভের যেমন সম্পর্ক, ধর্মের সাথে কর্মের সম্পর্কও ঠিক সেইরূপ নিবিড়। ইসলামে একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটার কল্পনা নিরর্থক। বৃক্ষ রোপনের মত, রাস্তা নির্মাণের মত, পুকুর খনন করার মত, ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করার মত, আদর্শ রাষ্ট্র গঠন করার মত' শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মত, গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোকে ধর্মেরই অঙ্গ বলা হয়েছে। সন্ন্যাসবাদের প্রভাবে পড়ে আমরা ইসলামের সুমহান আদর্শ থেকে অনেক পিছনে পড়ে গেছি।

তারপর হিন্দুরা যেমন লক্ষ কোটি প্রতিমা ও তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা অর্চনা করে থাকেন, আমরাও তেমনি লক্ষ কোটি শির্কের আড্ডাখানা গড়ে তুলেছি। অসংখ্য গোরপূজা, পীর পূজায় আমরা জড়িত হয়ে পড়েছি। পীরের নিকট সন্তানকামী মুসলমান নারীর প্রার্থনার একটি নমুনা উদ্ধৃত করছি। তারা তাদের মানসলক্ষ্য মানিক পীরের কাছে প্রার্থনা করে থাকে ঃ

সাত রাজার ধন তুমি আমার বাবা মানিক পীর
এসেছি তোমার দ্বারে হয়ে নিতান্ত অধীর।
দয়া করে একটি ছেলে
দাও আমার কোলে তুলে,
ঠাণ্ডা হোক কোলখানি মোর
মনটা হোক স্থির।
(আমি) ছেলে কোলে হেথায় আসি
দিব তোমায় জোড়া খাসি

www.draminlibrary.com

তোমার দ্বারে করবো হাজির
সাতটা হাঁড়ি ক্ষীর।
যেদিন ছেলে দিবে আমায়
(আমার) যা কিছু সব দিব তোমায়
আর পেট ভরিয়ে খাইয়ে দিব
একশত ফকীর
বাবা মানিক পীর।

এভাবে আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে অধিকাংশ মুসলমান আজ গায়রুল্লাহর দাসত্বে ফেঁসে গেছি। আমাদের ঘরে ঘরে এখন 'মা লক্ষ্মী' বিরাজ করছেন। গ্রামে কলেরা, বসন্ত হচ্ছে ঃ আল্লাহই রক্ষা করবেন। কিন্তু হিন্দুর বিশ্বাস শীতলা দেবী রক্ষা করবেন। তাই হিন্দু সমাজ শীতলার নামে অনেক কিছু মানত করে থাকেন। ওদের দেখাদেখি কলেরা বসন্ত হলে বাংলার বহু মুসলমানকেও হিন্দুর মত শীতলার নামে মানত করতে দেখা যায়।

প্রিয় নবীর নির্দেশ হচ্ছে মুসলমানদের সহিত মুসলমানের সাক্ষাৎ হলেই 'সালাম' দিতে হবে। কিন্তু হিন্দু প্রভাবের বন্যায় আমাদের 'সালাম'টুকুও আজ খড়কুটার মত ভেসে চলেছে। অফিসে, আদালতে, ট্রেনে, বাসে, রাস্তা-ঘাটে সর্বত্রই মানুষের ভীড়। কিন্তু কে যে চণ্ডিচরণ বাবু ও রামকান্ত বাবু আর কে যে সলিমুদ্দিন ভাই ও কলিমুদ্দিন ভাই–চেনাই মুশকিল। কারণ, মুসলমান তার বাহ্যিক পরিচয়ের 'সাইন বোর্ড'টুকু নর্দমায় ফেলে দিয়ে গুরু গোবিন্দের বাবা সেজে বসে আছেন।

অনেক সময় লক্ষ্য করা গেছে ইসলামী সভার চেয়ে হিন্দুর পূজার মেলায় মুসলমানের ভীড় অনেক বেশী। গান, বাজনা, থিয়েটারে ও সিনেমায় মুসলমান নর-নারীর ভীড় দেখে জনৈক কবি আক্ষেপ করে বলেছেন ঃ

মহ্‌ফিলে রাক্‌সো গানা মে
মরদো জান্‌কা হ্যায় হুজুম,
মজ্‌লিসে কুরআন মে আক্‌সর–
কা পাতা লাগ্‌তা নহী।

গান-বাজনার মহ্‌ফিলে নর-নারীর ভীষণ ভীড় দেখা যায় কিন্তু পবিত্র কুরআনের মজলিসে অধিকাংশ মুসলমানের কোন পাত্তাই পাওয়া যায় না।

গীতবাদ্য যে জাতির সর্বনাশ ঘটিয়েছে সে সম্পর্কে দার্শনিক ইকবাল বলেছেন ঃ

www.draminlibrary.com

'মায় তুঝ্‌কো বাতাতা হুঁ তাক্‌দীরে উমাম কিয়া হ্যায়, শামসীরে সিনা আওয়াল তাউসো রুবাব্‌ আখের।

আমি তোমাদের কাছে জাতির অদৃষ্ট লিপির রহস্য ভেদ করছি। জাতির উত্থানের সূচনা হয় তরবারী ও অস্ত্রের সাহায্যে, কিন্তু শেষ পরিণতি অর্থাৎ পতন ঘটায়–বীণা ও সেতারের তান।

বলা বাহুল্য, গীতবাদ্যের প্রতিষ্ঠান, ওর উদ্যম ও অবিশ্রান্ত চর্চা, মুসলিম সমাজে ওর অনিবার্য্যতা, মুসলমান শাসক কর্তৃক অকৃত্রিম ও একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতা মুসলমানদেরকে অনেক নিম্নস্তরে নামিয়ে দিয়েছে!

তারপর আমাদের ভদ্র মহিলাগণও আজকাল পিছনে পড়ে নেই। পর্দার ইনাদের বালাই নাই-ই। তারপর আবার কপালে টিপ বা ফোটা দিতে শিখেছেন। অথচ এটা যে প্রাচীন ভারতের রাক্ষস বিবাহের বলাৎকারের রক্তের প্রতীক–সেদিকে খেয়াল নেই। মুসলমানী নাম ছেড়ে দিয়ে এখন আমরা ছেলেমেয়েদের পল্টু, পিল্টু, হাগলু, লিটন, কবিতা, বকুল, শেফালী, পারুল প্রভৃতি নামে ডাকতে অধিক আনন্দ পাই। ইন্দোনেশিয়াতেও হিন্দু প্রভাব প্রবল। সুকর্ণের এক পত্নীর নাম জাপানী রত্নেশ্বরী, এক কন্যার নাম কার্তিকা ও অন্য কন্যার নাম মেঘবতী।

১৫ই শাবানের রাতে, কদরের রাতে, কারো জন্মতিথি উপলক্ষে ও স্বাধীনতা উপলক্ষে শহরে বন্দরে ও বিভিন্ন স্থানে হিন্দুদের দিপালীর মত মুসলমানরাও আলোক-সজ্জা করে থাকে। এই আলোক-সজ্জা ও আতশবাজী হিন্দুদের দেওয়ালীর নকল ছাড়া কিছু না। হিন্দুদেরকে দেওয়ালীর দিদে গৃহলেপন ও মাটির বাসনকোসন বদলাতে দেখে কোন কোন মুসলমানও একাজ করে থাকে।

এরূপ জাতীয় পতাকা জাতীয় গৌরবের নিদর্শন, ওকে উন্নত রাখাই হচ্ছে ওর প্রকৃত মর্যাদা। পতাকার উল্লিখিত সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে সাহাবা ও তাবেয়ীগণ অকাতরে প্রাণ-বিসর্জন দিয়েছেন কিন্তু জাতীয় পতাকাকে কোন ক্রমেই অবমানিত হতে দেননি কিন্তু তাই বলে তাঁরা কেউ পতাকার সম্মানার্থে দাঁড়াতেন না, কিংবা তাকে অভিবাদন করতেন না, প্রতীকের (Emblem) জন্য দাঁড়ানো আর তাকে সালাম করা জড়পূজকদের সংস্কার হতে পারে কিন্তু ইসলামী আদর্শের ঘোর পরিপন্থী।

চিত্র ও ফটো সম্বন্ধে আধুনিক সমাজে মতভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে কিন্তু চিত্র বা ফটোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন আর ওকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করার কার্যকে

www.draminlibrary.com

ইসলামী রুচির সাথে কোন ক্রমেই খাপ খাওয়ানোর উপায় নেই। কবরকে পুষ্প সজ্জিত করার নীতিও সম্পূর্ণ অনৈসলামিক। কিন্তু উল্লিখিত বিষয়গুলি মুসলমানদের জীবনের দস্তর ও এটিকেটে পরিণত হয়েছে।

তারপর পৌষ মাসে বিয়ে নেই; ভাদ্র মাসের প্রথম দিকে মেয়ে শ্বশুর বাড়ীতে থাকতে পারে না, রবিবারে বাঁশ কাটতে নেই, সন্ধ্যার পর পর ঝাঁট দিতে নেই, গরু বিক্রয় করলে তার লেজের কয়েকটি চুল ছিঁড়ে নিতে নয়, সকাল বেলায় খালি কলসী দেখলে দিন ভাল যায় না, সকালে খালি হাঁড়ি ও একচোখ দেখা কুলক্ষণ, পৌষ মাসে পৌষ সংক্রান্তি ও কবি-সাহিত্যিকদের জয়ন্তি-উৎসব পালন করতে হয়, এ ধরনের অনেক হিন্দুয়ানী আকীদা অনেক মুসলমান পোষণ করে থাকে।

বর্তমানে শহীদ মিনারের বংশ বিস্তার পেয়েছে সারা দেশের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্রাবাসের সম্মুখে। বাস্তবিক পক্ষে যত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় আর ছাত্রাবাসের সম্মুখে শহীদ মিনার আছে, সর্বত্রই কিন্তু ছাত্র শহীদ হয়নি। অথচ স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা হিন্দু রীতিরই অনুসরণ করে চলেছি। যেমন হিন্দুর মৃতদেহ যে কোন স্থানে দাহ করে ছাই অথবা শ্মশানের মাটি এনে বহুদূর দূরান্তে ইচ্ছামত স্থানে তার আত্মীয়-স্বজন অনুরূপভাবে স্মৃতিসৌধ স্থাপন করে আর সিঁদুর পুষ্পার্পণ করে পূজা অর্চনা করে থাকে। শহীদ মিনারকে লাল রং দিয়ে রক্ত প্রবাহের অনুকরণ করে শোকচিহ্নস্বরূপ কৃষ্ণবস্ত্রে আচ্ছাদিত রাখতে অনেক স্থানে দেখা যায়। আর শহীদ দিবসে করণীয় কার্য শেষ করে শহীদ মিনারের সম্মুখে এসে পুষ্পার্পণ করা হয়। বলা বাহুল্য এটা বস্তুবাদী হিন্দুদের বস্তু পূজার এক প্রচ্ছন্ন অভিব্যক্তি বৈ কিছু না।

আমাদের দেশের কিছু সংখ্যক মুসলমান কয়েক বছর হতে বর্ষ বরণ শুরু করেছে। তারা পহেলা বৈশাখকে ঢাকঢোল পিটিয়ে সারারাত জেগে গান-বাজনা ও আনন্দ-উৎসবের মাধ্যমে বরণ করে থাকে। অথচ এ কাজ হিন্দুদেরকেই আজীবন করে আসতে দেখেছি। আজকাল আবার মুসলমানদেরকে ঋতুবরণ করতে দেখছি। নানা প্রকার আমোদ আহলাদের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক উৎসবের ভিতর দিয়ে স্বাগত জানিয়ে ঋতুবরণ করা হয়। ঋতুটি কিন্তু শরৎ ঋতু এই ঋতুতে শারদীয় পূজার উৎসবে পুরো হিন্দু ভারতে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়। এই উৎসবের কারণ হচ্ছে হিন্দুদের মহাদেবী 'মা-দূর্গা' আগমন করেন ধূলির ধরায়। সুতরাং এই উৎসবের মাধ্যমে দুর্গাদেবীকে বরণ ও বিসর্জন করা হয়। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে যাত্রা অভিনয় ইত্যাদি গানে গানে দেশ আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে যায়। সেই হিন্দু অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতি আপামর মুসলমানদের মনে যে প্রভাব বিস্তার করেছে, এই ঋতুবরণ তারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আবার বসন্ত ঋতুকেও

www.draminlibrary.com

অনেক মুসলমান বরণ করে থাকেন। এটা হিন্দুদের চড়ক পূজার ঋতু। যে চড়কে চড়ে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে খোদাই দাবীকারী নমরূদ ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল। হযরত ইবরাহীমের অপরাধ ছিল তিনি আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস করতেন ও পৌত্তলিক ধর্মের বিরোধিতা করতেন। এ ঋতুকে মুসলমানদের স্বাগত জানিয়ে বরণ করাটা পরোক্ষভাবে তাদের আদর্শকেই সমর্থন করা ছাড়া আর কিছু না। এটা ইসলাম ধর্মে জঘন্য অন্যায়। মুসলমানদের এই যে বিজাতীয় অনুরাগ– এটা তাদের চরম পতনের লক্ষণ ছাড়া আর কি বলা যাবে।

বাদশাহরা আদর্শবোধ হারিয়ে ফেলেছিলেন

আমাদের রাজা বাদশাহগণও তাঁদের কর্তব্যবোধ একেবারে হারিয়ে ফেলেছিলেন। মোহাম্মদ বিন কাসিমের ৯৩ হিজরীতে সিন্ধু জয় করার পর হিন্দ্ উপমহাদেশের মুসলমান বাদশাহগণ প্রায় হাজার বছর ধরে বাদশাহী করলেন। কিন্তু মুসলমান হিসেবে যে কর্তব্য পালন করা উচিত ছিল– তা কোন বাদশাই পালন করতে পারেননি। তাঁদের অধিকাংশই যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যজয়, অট্টালিকা নির্মাণ আর আমোদ প্রমোদ নিয়েই মত্ত ছিলেন। মোহাম্মদ বিন কাসিম, আলপ্তগীন, সবুক্তগীন, সুলতান মাহমুদ, খসরু মালিক, মোহাম্মদ ঘোরী, বখতিয়ার খলজী, কুতুবুদ্দীন, আইবেক, শামসুদ্দীন, ইল্তুত মিস, সুলতানা রাজিয়া, গিয়াসউদ্দিন বলবন, সুলতান আলাউদ্দিন, মোহাম্মদ বিন তুগলক, ফিরোজ শাহ তুগলক, বাবর, শেরশাহ, হুমায়ন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, আমলগীর, মুর্শিদ কুলী খান, নবাব শুজাউদ্দীন খান, আলীবর্দী খান; নবাব সিরাজুদ্দৌলা প্রভৃতি নবাব বাদশাহগণের কেউ মুসলমানদের গৌরব ও মহিমাকে রক্ষার কোন ব্যবস্থাই করতে পারেননি। প্রথিতযশা সাধক খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকীর নামানুসারে কুতুবুদ্দীন আইবক দিল্লীতে কুতুব মিনারের কাজ আরম্ভ করেন আর তার নির্মাণ কার্য শেষ হয় শামসুদ্দীন ইলতুত্-মিসের দ্বারা। কিন্তু মুসলিম জাতির জন্য যে কাজ করা এঁদের উপর বিশেষভাবে ফরজ ছিল সে কাজ তাঁরা করেননি। সুলতান আলাউদ্দিন দিল্লীর নিকটে সাতটি তোরণ-বিশিষ্ট শিরিনগর ও তার মধ্যে এক হাজার স্তম্ভ বিশিষ্ট একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন, তার নাম দেওয়া হয় 'কাস্রে হাজার তুন'। কিন্তু মুসলিম জাতীয়-স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করার কোন উপযুক্ত ব্যবস্থাই তিনি করতে পারেননি। ফিরোজ শাহ তুগলকও বহু শহর, মসজিদ, প্রাসাদ, দূর্গ, হাসপাতাল, পান্থশালা ও স্মৃতিসৌধ নির্মাণ

www.draminlibrary.com

করেছিলেন কিন্তু তিনি মুসলিম জাতিকে গৌরবের হিমাদ্রি শিখরে বসাবার কোন চেষ্টাই করেননি। মুগল বাদশাদের অনেকে জ্ঞানচর্চা করলেও মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুরাই তার দ্বারা উপকৃত হয়েছে বেশী। সম্রাট বাবর তুর্কী, আরবী ও ফারসী ভাষার একজন বিরাট পণ্ডিত ছিলেন। তিনি 'তুজকী বাবরী' নামক একখানা নিজের যে আত্মকাহিনী লিখেছেন, তা থেকে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু উল্লেখযোগ্যভাবে তিনি মুসলমানদের কোন উপকার সাধন করতে পারেননি।

সম্রাট শেরশাহ একটা ভাল কাজ করেছেন। সেটা হচ্ছে বাংলা হতে কাশ্মীর যাবার সুদীর্ঘ একটি রাস্তা। বর্ধমানের কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক তাঁর অজয় নামক কাব্য গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

স্বর্গ না হোক ভূস্বর্গ যেতে
সড়ক বানালো শেরশা,
সিধা আগাগোড়া নয় বাঁকা চুড়া
কোনখানে নয় তেরচা।
ভারতের দুই প্রান্ত, এক করি তবে ক্ষান্ত
গঙ্গার এ যে সঙ্গীই বটে
দেখে মনে হয় ঈর্ষা।

এছাড়া শেরশাহ বহু দূর্গ নির্মাণ করেন। তার মধ্যে পাঞ্জাবের রোটাস ও দিল্লীর পুরাতন কিল্লা প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই রাস্তা ও দূর্গ নির্মাণের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে কাজ– সে কাজ শেরশাহ করতে পারেননি।

মানসিং, টোডরমল, আবুল ফজল, বীরবল, তানসেন, শেখ ফয়জী, আবদুর রহীম খাঁ, হেকিম হামাম খাঁ, মোল্লা দোপিয়াজা–এই ন'জন পণ্ডিতকে নিয়ে সম্রাট আকবর নবরত্ন সভা কায়েম করেছিলেন। এই সব পণ্ডিতদের নিয়ে জ্ঞানচর্চা করতে তিনি খুবই ভালবাসতেন। আকবর দিল্লীতে হুমায়ুনের সমাধি সৌধ, ফতেপুর সিক্রীর রাজমহল, ফতেপুর সিক্রীর বুলন্দ দরওয়াজা, শাহী মসজিদ, আটক ও এলাহাবারের দূর্গদ্বয়, আগ্রা দূর্গের জাহাঙ্গীর মহল, লাহোরের প্রাসাদ ও দুর্গ প্রভৃতি তৈরী করেছিলেন। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি ইসলামের প্রতি কর্তব্যবোধ হারিয়ে ফেলেছিলেন। আকীদায়, আচরণে ও চালচলনে তিনি হিন্দু বনে গিয়েছিলেন। তাই দেখা যায়, তিনি পবিত্র কুরআন ও ইসলামের অন্যান্য মৌলিক গ্রন্থরাজির ব্যাখ্যা ও প্রচারণার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে

www.draminlibrary.com

হিন্দু শাস্ত্রের প্রচারণায় মেতে উঠেছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় মহাভারত ও রামায়ণ ফার্সী ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রচারিত হয়। অথর্ব্ববেদ, সিংহাসন বত্তিসি, সংস্কৃত পঞ্চরত্ন ও অনেক জ্যোতিষ গ্রন্থের অনুবাদ ও প্রচারণা তাঁর আদেশে ও প্রচেষ্টায় কার্যকরী হয়। বেদান্ত-দর্শন ও পাতঞ্জলির শিক্ষাদানকে তিনি বাধ্যতামূলক করে দিয়েছিলেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের দ্বারাও ইসলামের আসল খেদমত হয়নি। তাঁর স্বরচিত তুজকী জাহাঙ্গীর গ্রন্থ হতে তার অসাধারণ জ্ঞানগরিমা ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এই অসাধারণ জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তাকে তিনি ইসলামের প্রকৃত খেদমতে লাগাতে পারেননি। তিনি সেকেন্দ্রায় সম্রাট আকবরের একটি জাঁকজমকপূর্ণ সমাধি-সৌধ তৈরী করে স্থাপত্য শিল্পে এক বিরাট কীর্তি রেখে গেছেন। অথচ যে কাজ তার উপর ফরজ ছিল– সে কাজ তিনি করতে পারেননি।

সম্রাট শাহজাহান যা করেছেন, তা মুসলিম জাতির জন্য আরও দুঃখজনক। ইসলাম ধর্মে কবরের উপর গম্বুজ বা সৌধ নির্মাণ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। অথচ শাহজাহান তাঁর স্ত্রী মমতাজের কবরের উপর এমন সৌধ নির্মাণ করলেন, যা মস্কোর ঘণ্টা, চীনের প্রাচীর, মিসরের পিরামিড, সাইপ্রাস দ্বীপের পুঁতুল, শূন্যে উদ্যান, টেম্‌স নদীর সুড়ঙ্গ প্রভৃতিকে হার মানিয়ে সপ্তাশ্চর্যের প্রথম স্থান অধিকার করলো। এই সৌধ নির্মাণ করতে বিশ হাজার লোককে বাইশ বছর খাটতে হয়েছিল ও নয় কোটি টাকা ব্যয় হয়েছিল। শাহজাহান দিল্লীতে শাহজাহানাবাদ নামক একটি মনোরম নগর তৈরী করেছিলেন। নয় কোটি টাকা খরচ করে তিনি ময়ূর সিংহাসনও তৈরী করেছিলেন। শুধু তাই নয়, দিল্লীর লাল কেল্লায় দেওয়ানে আম ও দেওয়ানে খাস শাজাহানের কুকীর্তির সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। 'দেওয়ানে খাস' এর গায়ে লেখা আছে–

'আগার ফেরদাউস বুরুরুয়ে জমিনাস্ত
হমিনাস্তো হামিনাস্তো হামিনাস্ত।

যদি দুনিয়ার বুকে জান্নাতুল ফেরদাউস থাকে তো এই 'দেওয়ানে খাস' হচ্ছে জান্নাতুল ফেরদাউস। মোট কথা দেশের ও জনগণের কোটি কোটি টাকা খরচ করে তিনি বড় বড় অট্টালিকা, সিংহাসন ও প্রাসাদমালা তৈরী করতেই ব্যস্ত ছিলেন। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে তিনি নামায-রোযা, ইবাদত-বন্দেগী ও কুরআন তেলাওয়াত করতেন আর আগ্রা দূর্গে মতি মসজিদ ও দিল্লীতে জামে মসজিদও

www.draminlibrary.com

তৈরী করেছিলেন। কিন্তু তিনি মুসলিম জাতির উল্লেখযোগ্য কোন খেদমত আ াম দিতে পারেননি।

বাদশা আমলগীর একজন সংযমী, আড়ম্বরহীন, নিষ্ঠাবান, ন্যায় বিচারক, প্রজা বৎসল, নামাযী ও পরহেজগার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারীও ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় 'ফতোয়ায়ে আমলগীরী' নামক একটি বিখ্যাত আইনগ্রন্থ দু'লক্ষ টাকা ব্যয়ে রচিত হয়। তিনি লাহোরের বিরাট বাদশাহী মসজিদ ও দিল্লীর জিন্নাতুন্নেসা মসজিদ নির্মাণ করেন। আবার অন্যদিকে দেখা যায় লাহোরের বাদশাহী মসজিদ সংলগ্ন বিরাট উদ্যানও তিনি তৈরী করেন। আওরঙ্গাবাদের মরিয়ম মাকানীর সমাধি-সৌধ তাঁর কীর্তি। তিনি দেশের মধ্যে বহু মক্তব মাদ্রাসাও তৈরী করেছিলেন। কিন্তু পরস্পর সম্পর্কহীন মক্তব মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা ও পাঠ্য তালিকার সমন্বয় সাধন করতে পারেননি। যা হোক, বাদশাহ আলমগীর একজন পরহেজগার ও ন্যায়পরায়ণ হয়েও মুসলমানদের জন্য যে কাজ করার বিশেষ দরকার ছিল, তা তিনি করতে পারেননি।

তারপর মুর্শিদাবাদের ভাগীরথীর তীরে হাজার দুয়ারী, দিলবাগ, আয়েশবাগ ও গোলাববাগ, আদিনার রাজপ্রাসাদ, গৌড়ের প্রাসাদমালা, একলাখী গম্বুজ প্রভৃতি মুসলমানদের কোন উপকারেই আসেনি। প্রায় হাজার বছর ধরে মুসলমানরা এদেশে বাদশাহী করা সত্ত্বেও বড়ই দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে, ব্যাপক আকারে, সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে, সুব্যবস্থিত উপায়ে মুসলিম সংস্কৃতির রক্ষাকল্পে একটা 'ইউনিভারসিটি' কেউ গড়ে তুলতে পারেননি। প্রমোদ ভবন, তাজমহল, কুতুবমিনার, ময়ুর সিংহাসন, দেওয়ানে আম, দেওয়ানে খাস, আদিনার প্রাসাদ, একলাখী গম্বুজ, হাজার দুয়ারী, দেলবাগ, আয়েশবাগ, গোলাপবাগ, সমাধি-সৌধ কোন কিছুরই আমাদের প্রয়োজন ছিল না। আমাদের প্রয়োজন ছিল ইউনিভারসিটির। যদি কেউ একটা ইউনিভারসিটির প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারতেন তাহলে আমরা তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকতাম। আবার আমাদের মাঝে লক্ষ লক্ষ বীর মুজাহিদ তৈরী হয়ে ইসলামের সেই অতীত গৌরব ও মহিমাকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হতো। কিন্তু সেই সুযোগ এ জাতি পেলো না। বিপুল শক্তি-সামর্থ্য ও প্রচুর সুযোগ সুবিধে পাওয়া সত্ত্বেও যে জাতির রাজা বাদশাহগণ তাদের স্বকীয়-সত্তা ও আদর্শকে রক্ষা করতে পারেননি, তাদের জন্য যে যতই 'পেদারাম পাদ্‌শাহ বুদ্'– 'পেদারাম পাদ্‌শাহ বুদ্' বাবা আমাদের বাদ্‌শাহ ছিলেন– বাবা আমাদের বাদ্‌শাহ ছিলেন– বলে গর্ব করুক না কেন, আমি বলবো তারা জাতির কলঙ্ক। মুসলিম জাতির অধঃপতনের জন্য তাঁরা বহুলাংশে দায়ী।

www.draminlibrary.com

আমরা বিলাতী কায়দায় স্বদেশী সাহেব

তারপর বাপে তাড়ানো মায়ে খেদানো ক্লাইভ যখন এদেশে এল, তখন সে আমাদের সামগ্রিক অবস্থাটা আন্দাজ করে নিল। এবং খুশীতে বাগবাগ হয়ে গেল। সে বুঝে নিল যে জাতির মধ্যে একতা নেই; যে জাতির আলেম সমাজের মধ্যে দলীয় সংকীর্ণতা বিরাজ করছে; যে জাতি তাদের ধর্মীয় কর্তব্যবোধ হারিয়ে ফেলেছে, যে জাতির সমস্ত প্রকৃতি হিন্দুয়ানী রূপ গ্রহণ করেছে, যে জাতির সামাজিক জীবনের রীতিনীতি আর ব্যক্তিগত আচরণ ও চালচলন হিন্দুর মত হয়েছে; যে জাতির শাসকবৃন্দ তাদের বিপুল ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে; যে জাতির শাসকবৃন্দ প্রায় হাজার বছর বাদশাহী করলো অথচ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করতে পারেনি; যে জাতির বাদশাহগণ শাহী মহলের বিলাস ও আড়ম্বর-প্রিয় জীবনকেই পছন্দ করে নিয়েছিল; সে জাতিকে গ্রাস করতে আর কতক্ষণ। তাই সুচতুর ক্লাইভ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার প্রধান সেনাপতি মীর মোহাম্মদ জাফর আলীর মত এক মস্ত বড় মুনাফিক, স্বার্থপর, বিশ্বাসঘাতক, মুসলমানকে হাত করে নিল। আর এদেশে মুসলমানদের বাদশাহী করার সাধ চিরতরে খতম করে দিল। এবার ইংরেজ জাতি জেঁকে বসলো আমাদের বুকের উপর। আর পাশ্চাত্যের অনৈসলামিক শিক্ষা ব্যবস্থা আমদানী করতে শুরু করে দিল। আলেকজাণ্ডার ডাফ ও ডেভিড হেয়ারের মত পণ্ডিতরা স্পার্টা ও এথেন্সের আদর্শকে টেনে নিয়ে এলো। ইংরেজ কুটনীতিবিদদের অন্যান্য জাতির চেয়ে মুসলমানদের সম্পর্কেই চিন্তা ছিল বেশী। কারণ সদ্য স্বাধীনতা হারা, রাজ্যহারা, সম্পদহারা মুসলমানদের অনেকের রক্ত তখনো টগবগ করছিল। কিন্তু দুর্বার স্রোতের মুখে তারা করতে কিছুই পারেননি। কোন জাতিকে ধ্বংস করতে হলে তার সাহিত্য, কৃষ্টি ও চরিত্রকে নষ্ট করতে হয়। তাই ইংরেজ পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে লাগলো। ভাড়াটিয়া লেখকদের দ্বারা আমাদের সাহিত্য ও ইতিহাসের উপর একটা বিরাট আঘাত হানতে শুরু করে দিল। পতিতালয় ও মদের আড়ত স্থাপিত হল। পরে ধীর ধীরে অর্ধনগ্ন ও বিকৃত চরিত্রের সহায়ক আর যৌন-উত্তেজক ছবি-সম্বলিত সিনেমা ও বায়স্কোপ আমদানী করা হল যাতে করে মুসলমানদের ভাবী বংশধর যুবক ও সরলমতি ছাত্র সমাজের চরিত্র নষ্ট হয়। কার্যক্ষেত্রে হয়েছেও তাই। সুচতুর ইংরেজ পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমে অর্থ ও চাকুরীর লোভ দেখিয়ে, বিভিন্ন কলা-কৌশল অবলম্বন করে মুসলমানদেরকে প্রভুভক্ত বানাতে শুরু করে দিল। আমরাও পাইকারী হারে 'বিলাতী কায়দায় স্বদেশী সাহেব' বনতে শুরু করে

www.draminlibrary.com

দিলাম। 'যেমন তেমন চাকরী ঘি-ভাত' এর নেশায় অনেকে মেতে উঠলাম। ইংরেজ এদেশে দু'শো বছর যাবৎ আমাদের বুকের উপর গোলামীর জগদ্দল পাথর চাপিয়ে রেখেছিল। এই দু'শো বছরের গোলামী আমাদের জীবনে এক বিরাট অভিশাপ ছাড়া আর কিছু না। গোলামী করতে করতে আমরা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছিলাম তার একটা দৃষ্টান্ত আছে। ইসলাম ধর্মে জনগণের-মনের একমাত্র মালিক হচ্ছে আল্লাহ। একমাত্র আল্লাহরই জয়গান গাইতে হবে, আল্লাহরই আশিস মাগ্‌তে হবে। আল্লাহ ছাড়া ভাগ্যবিধাতা ও মঙ্গল বিধানকারী আর কেউ হতে পারে না। আর বিশ্ব চরাচরের সার্বভৌম অধিপতি হচ্ছেন আল্লাহ। কিন্তু পঞ্চম জর্জ যখন এদেশে এলেন তখন তাঁর উদ্দেশ্যে ইংরেজ ভক্তদের অনুরোধে রবিঠাকুর একটা গান রচনা করে দিলেন। আর সেই গান হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে প্রভুভক্তরা গাইতে শুরু করে দিল ঃ

জন-গণ-মন অধিনায়ক জয় হে
ভারত ভাগ্যবিধাতা।
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা
দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ হিমাচল যমুনা গঙ্গা
উচ্ছল জলধি তরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে
তব শুভ আশিস মাগে
গাহে তব জয় গাথা
জন-গণ-মঙ্গল বিধায়ক জয় হে
ভারত ভাগ্যবিধাতা।
..... ইত্যাদি।

এখানে মহান আল্লাহর সৃষ্টি একটি মানুষকে জন-গণ-মনের অধিনায়ক, দেশের ভাগ্যবিধাতা ও জনগণের মঙ্গল বিধানকারী বলে স্বীকার করে তার শুভ আশিস চাওয়া হয়েছে। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর' ধারক, বাহক ও প্রচারকদের জীবনে এর চেয়ে অভিশাপ আর কি হতে পারে।

শুনেছিলাম মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পায়ে একটা কাঁটা বিদ্ধ হয়েছিল। তজ্জন্য তিনি খুঁড়িয়ে হেঁটেছিলেন। তাই দেখে ইংল্যান্ডের স্কুল, কলেজ, ইউনিভারসিটির ছাত্রীরা সব মহারাণীর মত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছিল। এ অবস্থা দেখে মহারাণী সবাইকে ডেকে বলেছিলেন, তোমরা যে আমাকে গভীরভাবে

www.draminlibrary.com

ভালবেসেছো, তা তোমাদের চলার ভঙ্গিমা দেখে আমি বুঝতে পারছি। তবে একটা কথা বলি শুন, তোমরা এই ব্যাপারে আমার অনুকরণ করো না, কেননা এটা আমার চলার কোন 'ফ্যাশন নয়'–পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হওয়ায় খুব ব্যথা হয়েছে বলেই এভাবে আমাকে চলতে হচ্ছে, একটু সুস্থ হলেই স্বাভাবিকভাবে হাঁটবো।

বলা বাহুল্য মুসলমানদের জীবনেও এর কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। বার নদী তের সমুদ্র পারে বসে বড় সাহেবরা যা করে গেছেন, আমাদের স্বদেশী সাহেবরা সেগুলোকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করেছেন। কবে কোন্ বড় সাহেব টেডি পোষাক পরে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছেন, ব্যাস আর যায় কোথায়, আমাদের এক শ্রেণীর কাছে সেটাই হয়ে গেছে আদর্শ। কবে কোন্ বড় সাহেব বঙ্কিম ভঙ্গিমায় সিগারেট টেনে ধুঁয়া ছেড়েছেন, ব্যাস সেটাও হয়ে গেল আমাদের সাহেবদের আদর্শ। কবে কোন্ বড় সাহেব বাম হাতে চা-পান করেছেন, তাই দেখে আমাদের অনেক বন্ধু বাম হাতে চা-পান খাওয়াটাকে চরম ভদ্রতা বলে মনে করে নিয়েছেন। কবে কোন্ বড় সাহেব দাড়ি চেঁচে 'আল্‌বার্ট' ফ্যাশনে চুল ছেঁটে এসেছিলেন, তাইনা দেখে অনেক বন্ধু দাড়ি চাঁচা ও 'আলবার্ট' ফ্যাশনে চুল ছাঁটাকে চরম সভ্যতা মনে করে নিয়েছেন।

বাংলা ১৩৭০ সালের একটি ঘটনা। তখন আমি কলকাতা ১নং মারকুইস লেনে 'মাসিক তওহীদ' এর সম্পাদনা করতাম। একদিন রাত তিনটা হতে খুব ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ভোর হয়ে গেল তবুও ঝড় বৃষ্টির থামাথামি নেই। আবহাওয়া খুব খারাপ, ভীষণ দুর্যোগ, লোক ঘর হতে বের হতে পারছে না। আমি ফজর পড়ে বসে আছি। এক অফিসার ভদ্রলোক পাশের রুমে থাকতেন, তিনি এক বদনা পানি নিতে এসে আমাকে দেখেই বললেন, বর্ধমানী সাহেব! 'গুড মর্নিং। আমি বললাম, কি ভাই সাহেব! আজকের মর্নিংটা খুব 'গুড' নাকি? ঝড় বৃষ্টির তাণ্ডব নৃত্য চলছে, কত গাছ-পালা ভেঙ্গে পড়ছে; কত ঘরের চাল উড়ে যাচ্ছে, কত ঘর বাড়ী ও জমির ফসল পানিতে ডুবে যাচ্ছে, মানুষ কাজে কামে বের হতে পারছে না, আবহাওয়া যেখানে এত খারাপ, সেখানে আপনি বলছেন, 'গুড মর্নিং'। তাই বলি সাহেব, আজকের মর্নিংটা খুব 'গুড' নাকি? সাহেব একটু থমমত খেয়ে গেলেন। আমি বললাম, এ ভুল আর করবেন না। দেখুন, পাশ্চাত্য ভাবধারায় বিমুগ্ধ হয়ে আপনারা দেশীয় সাহেব বনে গেছেন, কিন্তু জেনে রাখুন, সব জায়গায় 'গুড মর্নিং' চলে না। সহীর মিয়ার আব্বা মারা গেছেন রাত তিনটায়। তিনি পিতৃশোকে কাতর হয়ে পড়েছেন, আর আপনি যদি সকাল বেলায় তাঁকে যেয়ে বলেন, সহীর ভাই! 'গুড মর্নিং' তাহলে সেটা কি ঠিক হবে? সলীম মিয়ার বাড়ীতে রাতে ডাকাতি হয়ে গেছে, তার পরিবারের সকলকেই মারপিট করে ডাকাত দল ঘরের যথাসর্বস্ব নিয়ে পালিয়েছে। তাঁর এই বিপদের সময়

www.draminlibrary.com

সকালে যেয়ে তাকে যদি বলেন, সলীম ভাই 'গুড মর্নিং'। তারপর মনে করুন আপনি একটা গোরস্তানের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন, দেখলেন সেখানে কিছু সংখ্যক লোক একটা লাশের দাফনের কাজে ব্যস্ত রয়েছেন, আপনি যদি সে সময়ে তাঁদেরকে 'গুড মর্নিং' বলেন, তাহলে কি সেটা সমীচীন হবে? তখন তিনি বললেন, তাহলে কি সালাম দেওয়াটাই ভাল হবে? বললাম নিশ্চয়ই। 'আসসালামু আলাইকুম' এর তুলনাই নেই। 'আপনার উপর আল্লাহর শান্তি ধারা বর্ষিত হোক', একথা উত্থানে পতনে, হর্ষে, বিষাদে, সুখে, দুঃখে, সম্পদে, আনন্দে, নিরাশে, সাহসে, স্বদেশে, বিদেশে, হাটে, বাজারে, মক্তবে, মাদ্রাসায়, স্কুলে, কলেজে, ইউনিভারসিটিতে, অফিসে, আদালতে, ট্রেনে, বাসে, রাস্তা-ঘাটে সর্বত্রই বলা চলে। ভদ্রলোক বুঝলেন এবং আমার সম্মুখ হতে সরে যাবার সময় আমাকে সালাম দিয়ে গেলেন। এরপর হতে অন্ততঃ পক্ষে তাঁকে আর সালামের ব্যাপারে ভুল করতে দেখিনি। দুঃখের বিষয় এই যে, পাশ্চাত্য ভাবধারায় বিমুগ্ধ হয়ে লক্ষ লক্ষ মুসলমান আজ শত শত ব্যাপারে ইংরেজের অনুসরণ করেই চলেছেন। অথচ প্রিয় রসূল (সঃ) বলেছেন, 'মান্‌তাশাব্‌বাহা বি কাওমিন ফাহুয়া মিন্‌হুম' যে ব্যক্তি যে জাতির অনুকরণ করবে সে সে জাতিরই পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

পাশ্চাত্যের সিনেমার নেশায় পড়ে আমাদের ছাত্র-ছাত্রী, তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতীদের চরিত্র ও আকিদার যে কি সর্বনাশ হয়েছে তা আর না বলাই ভাল। আধুনিক সভ্যতার জন্য সবাই আজ ব্যস্ত। কিন্তু প্রত্যেক মুসলমানের জেনে রাখা উচিত যে, আধুনিক সভ্যতা বলতে যা বুঝায়, তার জন্মস্থান ইসলামের জন্মস্থান আরবভূমি নয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার সূতিকাগারে তার জন্ম। পাশ্চাত্য সভ্যতার তত্ত্বকথা হচ্ছে, 'মানুষ সমাজবদ্ধ পশু'। পান, ভোজন প্রজনন ও বাঁচা মরার ব্যাপারে মানুষ ও পশুতে কোন পার্থক্য নেই। এই মূল তত্ত্বকে কেন্দ্র করে কালের ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন পোষাকে সজ্জিত হয়ে বেকন, হিউস, ডারুইন, পপেন হাওয়ার, হিগেল, স্পেন্সর, 'মিল', বেন্‌থাম, মেকিয়াভেলী, রুষো, ভলটেয়ার, নিটশে, এঙ্গেল্‌স, মার্কস্, হিটলার, লেনিন ও স্ট্যালিনের মত পণ্ডিতরা তাঁদের মতবাদ প্রচার করেছেন। আর সেগুলো আমাদের ছেলে-মেয়েদের মাথায় পাঠ্যপুস্তক ও সিনেমার মাধ্যমে প্রবেশ করছে। আর এর পরিণতি স্বরূপ তারা নাস্তিক ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাচ্ছে।

ইসলামের মূল কথা হচ্ছে আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা। ইসলাম বলে তুমি কাপড় তৈরী করতে পারো সূতা দিয়ে, সূতা তৈরী করতে পারো তুলা দিয়ে কিন্তু তুলা তুমি তৈরী করতে পারো না। এই তুলার যিনি স্রষ্টা তিনিই মহান আল্লাহ। প্রতিটি মৌলিক পদার্থকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, যার অলঙ্ঘনীয় বিধানে বিশ্ব চরাচরের প্রতিটি অণুপরমাণু নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে–তিনিই আল্লাহ। তাঁকে

www.draminlibrary.com

বিশ্বাস করার নাম ঈমান। এই ঈমান যার নেই তার নাম আব্দুর রহমান হোক আর আব্দুস সালাম হোক, সে মুসলমান নয়। কিন্তু অসংখ্য নর-নারী আজ আধুনিক সভ্যতার গোলকধাঁধায় পড়ে নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে। নাস্তিক হওয়ার মানেই হচ্ছে সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে যাওয়া। আর স্বাধীন হওয়ার মানে যা ইচ্ছা তাই করা। স্রষ্টাই যখন নেই তখন স্রষ্টার আইন-কানুন ও আদেশ-নিষেধ আবার কি? তাঁর কাছে জওয়াবদিহির আবার প্রশ্ন কি? অতএব যা ইচ্ছা তাই করো, যা মন তাই খাও আমোদ ফূর্তি উড়াও।

কিন্তু মুসলমান হচ্ছে আল্লাহর জন্মগত প্রজা। যা ইচ্ছা তাই সে করতে পারে না। পূর্ণ স্বাধীনতা তার নেই, তাকে আল্লাহর হুকুম মেনেই চলতে হয়। দুঃখের বিষয় মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়ে মুসলমান নাম ধারণ করে লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী, তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের নাস্তিক হয়ে যাওয়াটা মুসলিম জাতির এক চরম অধঃপতন ছাড়া আর কিছু না। মুসলমান হয়ে যারা আচার ব্যবহারে, পোষাকে-পরিচ্ছদে, চিন্তাচর্চায়, আকিদায় ও আমলে বিজাতীয় ভাবধারা অনুকরণ করাকেই কৃতিত্ব মনে করেন তাদের প্রতি আল্লামা ইকবাল শ্লেষের সুরে বলেছেন ঃ

ওজা' মে তোম্ হো নাসারা
তো তামাদ্দুন মে হুনুদ
ইয়ে মুসলমাঁ হেঁয় জিন্হেঁ
দেখ্কে শারমায়ে ইয়াহুদ।

তোমরা পোষাকে-পরিচ্ছদে, কৃষ্টি-কালচারে, আচার-অনুষ্ঠানে, আকিদায়-আমলে হিন্দু ও খ্রীষ্টানের মত হয়েছো। তোমরা এরূপ মুসলমান যাদেরকে দেখে চির অভিশপ্ত ইয়াহুদীরাও লজ্জা পায়।

আমাদের কেবল শূন্যগর্ভ আস্ফালন

একথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পবিত্র কুরআন ও হাদীসেরই অপর নাম হচ্ছে ইসলাম। যারা পবিত্র কুরআন ও হাদীস মেনে চলে তারাই মুসলমান। আর যারা মানে না তারা মুসলমান নামের অযোগ্য। আজ আমরা মুসলমান, মুসলমান বলে যে দাবী করছি সেটা সত্যিকার দাবী না 'শূন্য গর্ভ আস্ফালন' তা কুরআন ও হাদীসেরই আলোকে বিচার করে দেখতে হবে। ইসলামের নির্দেশ, তোমরা আল্লাহর বিধানকে আঁকড়ে ধরে থাকো, খবরদার গৃহবিবাদ করে নিজেদের সংহতিকে ধ্বংস করো না। আমরা ইসলামের এই নির্দেশ কি মেনে চলছি,

www.draminlibrary.com

কখনো না। আল্লাহর বিধানে লাথি মেরে শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের সংহতিকে ধ্বংস করে তবে ছেড়েছি।

ইসলামের নির্দেশ, তোমরা পরকীয় অনুরাগ পোষণ করো না। কিন্তু আমরা কি শুনছি? শুনি না। শত শত ব্যাপারে আমরা হিন্দু ও খ্রীস্টানের অন্ধ অনুকরণ ও অনুসরণ করেই চলেছি। এবং সেটাকে গর্বের বিষয় বলে মনে করছি।

ইসলামের নির্দেশ, তোমরা পরোপকার সাধনে ব্রতী হও, নিজের ধন-সম্পদ হতে অভাবগ্রস্ত আত্মীয়-স্বজনের জন্য, অনাথ বালক বালিকার জন্য, দীন দরিদ্রের জন্য, পথিক ও ভিক্ষুকের জন্য সন্তুষ্টচিত্তে ব্যয় করো। কিন্তু আমরা তা করি কি? পরের উপকার করাতো দূরের কথা বরং বিপদে ফেলার জন্য আরও চেষ্টা করে থাকি। আমরা ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখতে চাই। কেউ অভাবের তাড়নায় কষ্ট পেলে আমরা দাঁতের গোড়ায় গোড়ায় হাসি। মনে মনে বড়ই আনন্দ পাই। অভাবগ্রস্ত আত্মীয়দেরকে আমরা আত্মীয় বলে স্বীকার করতেই চাই না। অনাথ-অনাথিনী, কাঙ্গাল-কাঙ্গালিনী ও ভিখারী-ভিখারিণীর করুণ আর্তনাদ আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না।

ইসলামের মহামন্ত্র হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু-মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'। এই মহামন্ত্র যার অন্তরে গাঁথা থাকবে, এই মহামন্ত্রের প্রতি যার পূর্ণ আস্থা থাকবে-সে হবে পূর্ণ মুসলমান। এই মহামন্ত্রের তাৎপর্য হচ্ছে আল্লাহ একক, তিনি অদ্বিতীয়, অন্নদাতা ও তৃষ্ণানিবারণকারী তিনি, ন্যায় অন্যায়ের সন্ধানদাতা তিনি, অবিমিশ্রিত, সমকক্ষ বিহীন ও জন্মজননের অতীত তিনি, আদি, অন্ত, চির ীবি, অক্ষয়, অব্যয় ও সদাজাগ্রত তিনি, অতি বিশুদ্ধ মহাপবিত্র, শান্তির উৎস, মহাসত্য, জ্যোতির্ময় ও অবিনশ্বর তিনি, তিনি ভিন্ন বিপত্তারণ, আশ্রিত বৎসল, ত্রাণকর্তা, রক্ষাকারী ও মহোপকারী কেউ নেই, মহাদাতা তিনি, শ্রেষ্ঠ অবলম্বন তিনি। তিনি ছাড়া কেউ উপাস্য নেই, পূজা অর্চনা তাঁরই করতে হবে, ইবাদত আরাধনা তাঁরই করতে হবে। সৃষ্টির সেরা মানব আমি। আমার এই গর্বিত ললাট একমাত্র তাঁরই কাছে নত হবে।

কিন্তু আমরা মুসলমান, আল্লাহ ছাড়া হাজারো প্রভু আজ আমাদের চিত্তফলকে জেগে উঠেছে। এখন আমাদের অন্নদাতা, তৃষ্ণানিবারণকারী, পথের সন্ধানদাতা, রক্ষাকর্তা, আশ্রয়দাতা, সংহারকর্তা, অভয়দাতা ও শ্রেষ্ঠ অবলম্বন, আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কেউ। কবির ভাষায়, অপূজ্য পূজিত হয় বিশ্বপতি ছাড়া, জীব শ্রেষ্ঠ নর হয় সত্য জ্ঞান হারা। চলিছে পূজার স্রোত দিবায় নিশায়, দীন ও ঈমানত্যাগী-স্রষ্টা বিধাতায়। রিপুর পূজক কেউ শক্তি উপাসক, লোভের পূজারী কেউ ইন্দ্রিয় সেবক। গাছের পূজারী কেউ কেউ পাথরের, কবরপূজক, কেউ লোভী

www.draminlibrary.com

মানতের। ইচ্ছার পূজক কেউ আত্মসুখ প্রয়াসী, বিলাস ব্যসনে কেউ মত্ত দিবানিশি। শঠ ব্যবসায়ী কেউ নামের পূজক, যশান্বেষী কেউ কেউ প্রাধান্য সাধক। ছবিমূর্তি পূজে কেউ ভক্তি অর্ঘ্যদানে, জড় ও জীবে পূজে কেউ সভয় সজ্ঞানে। দেশের পূজক কেউ দেশ নায়কের, কেউ পূজে প্রাণভয়ে যুক্তি অপরের। ফলকথা আল্লাহকে ছেড়ে অসংখ্য উপাস্যের পূজায় আমরা বিভোর হয়ে পড়েছি।

এই মহামন্ত্রের আরও তাৎপর্য হচ্ছে হযরত মুহাম্মদ আল্লাহর প্রেরিত রসূল। কেউ ব্যক্তিগত সাধনায় আল্লাহর ওলী দরবেশ ও সাধক হতে পারে, কেউ ব্যক্তিগত সাধনায় পৃথিবীর বহু কাজে উন্নতি করতে পারেন; কেউ ব্যক্তিগত সাধনায় বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক, ব্যবসায়িক ও রাজনীতিবিদ হতে পারেন। কেউ ব্যক্তিগত সাধনায় পি.এইচ.ডি, ডি.লিট.বার, এট.ল' প্রভৃতি ডিগ্রী নিতে পারেন, কেউ জনগণের ভোট নিয়ে প্রধান মন্ত্রী হতে পারেন, রাষ্ট্রপতি হতে পারেন, আইন পরিষদের সদস্য হতে পারেন, কিন্তু ব্যক্তিগত সাধনায় বা জনগণের ভোট নিয়ে কেউ নবী বা রসূল হতে পারে না। মহান আল্লাহ কোটি কোটি মানবের মধ্য হতে যাকে মনোনীত করেন তিনিই হন নবী বা রসূল। হযরত মুহাম্মদ আল্লাহর পয়গামবাহী রসূল, কোটি কোটি মানবের দিকদিশারী রূপে, হিদায়াতের জ্বলন্ত ভাস্কররূপে পৃথিবীর বুকে তাঁর আগমন ঘটেছিল। তাই মুসলমান কখনো হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ছাড়া পৃথিবীর কোন ব্যক্তিকে আদর্শরূপে গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মুসলমান এখন আপন আপন রুচি মাফিক পথপ্রদর্শক ঠিক করে নিয়েছে। কি রাজনীতি, কি অর্থনীতি, কি সমাজনীতি সকল ক্ষেত্রে মুসলমানের লক্ষ্য এখন ভিন্ন ভিন্ন। রসূলে আরাবীকে ছেড়ে দিয়ে কেউ ধরেছে রুষোকে, কেউ ভল্‌টেয়ারকে, কেউ ধরেছে লেনিনকে, কেউ ধরেছে স্ট্যালিনকে, কেউ ধরেছে মাও সেতুংকে, কেউ ধরেছে অমুককে, কেউ ধরেছে তমুককে–এভাবে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহর উম্মত আমরা শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। এটাকে জাতীয় জীবনের চরম পতনই বলতে হবে।

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে এই নামাযের জন্য তাকিদ দেওয়া হয়েছে। যে বিষয়ে বারংবার তাকিদ দেওয়া হয়, সেটা অত্যধিক দরকারী বলেই প্রমাণিত হয়। নামায অত্যধিক দরকারী বলেই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এত তাকিদ দেওয়া হয়েছে। এই নামায বান্দাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের অধিকারী করে দেয়। আভিজাত্যের মান অভিমানকে, আত্‌রাফ আশ্‌রাফের ব্যবধানকে, আমিরী গরীবীর পার্থক্যকে, ছোট বড়র ব্যবধানকে, বিভেদের দুর্লংঘ প্রাচীরকে দূর করে দিয়ে সাম্যের মোহন ছবি ফুটিয়ে তোলে এই নামায। ভাষাভিত্তিক পার্থক্যকে

www.draminlibrary.com

নামায চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছে। আমি বাংলার মুসলমান বাংলায় কথা বলি, আপনি বিহারের মুসলমান উর্দূতে কথা বলেন, একজন লন্ডনের মুসলমান ইংরেজীতে কথা বলেন, আসামের মুসলমান অসমীয়া ভাষায় কথা বলেন, এভাবে যে দেশের যে ভাষা, সেই সেই দেশের মুসলমান সেই সেই ভাষায় কথা বলেন, কিন্তু সকল দেশের মুসলমান একত্রিত হয়ে যখন একই ইমামের পিছনে একে অপরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে নামায পড়ি, তখন ভাষার পার্থক্য আর থাকে না। সকল ভাষা একাকার হয়ে যায়। নিজ নিজ মাতৃভাষা ভুলে সবাই তখন কুরআনের ভাষায়, বেহেশ্‌তী ভাষায়, মহানবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর ভাষায় কথা বলি। ৯ই জিলহজ্জ তারিখে আরাফাতের মাঠে গেলে এ দৃশ্য দেখা যায়। এ দৃশ্য বা এ আদর্শ হিন্দু সমাজে নেই। এ আদর্শ কেবলমাত্র ইসলামের বৈশিষ্ট্য। এই নামায যে না পড়ে সে কুফরীর স্তরে নেমে যায়। দুঃখের বিষয় এহেন নামায শতকরা নব্বইজন মুসলমানের কাছে আজ উপেক্ষিত। মসজিদগুলো আজ নামাযী শূন্য হয়ে পড়েছে। কবি ইকবাল বলেন, 'মসজিদে মর্‌সিয়া খাঁ হ্যায় কে নামাযী না র‍্যাহী'। নামাযী শূন্য হয়ে পড়ায় মসজিদগুলো আজ আফসোস করে মরছে।

ইসলামের নির্দেশ, তুমি রামাযান চান্দ্রমাসে সিয়ামব্রত পালন করো অর্থাৎ রোযা রাখো। রোযার তাৎপর্য হচ্ছে নিদ্রার দাবী, অহমিকার দাবী, পেটের দাবী ও যৌন ক্ষুধার দাবীকে নিয়ন্ত্রিত করা। কিন্তু আমরা অধিকাংশ মুসলমান রোযার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করে কি রোযা রাখি? কখনো না। ক্রোধ সংবরণ করতে পারি না, অহঙ্কারকে আমরা বর্জন করতে পারি না। পেটের চাহিদা মিটাবার জন্য যে কোন পথ আমরা অবলম্বন করে থাকি। কাম রিপুর চাহিদা মিটাতে আমরা পশুর চেয়েও নিম্নস্তরে নেমে পড়েছি।

ইসলামের নির্দেশ, তুমি অহঙ্কার বর্জন করো। কিন্তু আমরা কি অহঙ্কার বর্জন করতে পারছি? কখনই না। কেউ ধনের অহঙ্কারে, কেউ জনের অহঙ্কারে, কেউ বিদ্যার অহঙ্কারে, কেউ বুদ্ধির অহঙ্কারে, কেউ শক্তির অহঙ্কারে, কেউ শৌর্যবীর্যের অহঙ্কারে, কেউ রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অহঙ্কারে, কেউ রূপলাবণ্যের অহঙ্কারে কেউ গাড়ী বাড়ী ও বাগবাগিচার অহঙ্কারে মেতে রয়েছি। 'অহঙ্কার করিলে পতন নিশ্চয়' একথা আমরা ভুলেই গেছি।

ইসলামের নির্দেশ, তুমি মুনাফিকী ও শঠতাকে পরিত্যাগ করো। কিন্তু আমরা এই মুনাফিকী ও শঠতাকে কি বর্জন করতে পারছি? মোটেই না। মুনাফিক না হতে পারলে, শঠ ও প্রবঞ্চক না হতে পারলে, ভিতরে এক কথা আর বাইরে আর এক কথা না বলতে পারলে, ধোকা ও স্তোক বাক্য না দিতে পারলে, আজকাল রাজনীতিবিদ হওয়া যায় না। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাই। শুধু তাই নয়, এই মুনাফিকীর জন্যই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা কেউ কাউকে বিশ্বাস

www.draminlibrary.com

করতে পারি না। বাদশাহ পারে না তার উজিরকে বিশ্বাস করতে, উজির পারে না বাদশাহকে বিশ্বাস করতে! রাষ্ট্রাধিনায়ক পারে না তার সেনাবাহিনীকে বিশ্বাস করতে আর সেনাবাহিনী পারেনা তাদের রাষ্ট্রাধিনায়ককে বিশ্বাস করতে। স্ত্রী পারেনা তার স্বামীকে বিশ্বাস করতে আর স্বামী পারেনা তার স্ত্রীকে বিশ্বাস করতে, পিতা পারেনা তার পুত্রকে আর পুত্র পারেনা আর পিতাকে বিশ্বাস করতে, ভাই পারেনা ভাইকে বিশ্বাস করতে, গুরু পারেনা তার শিষ্যকে বিশ্বাস করতে, আর শিষ্য পারেনা তার গুরুকে বিশ্বাস করতে। বলাবাহুল্য, এই মুনাফিকীর জন্যই সমাজের প্রতিটি স্তরে আজ অশান্তির আগুন জ্বলছে।

ইসলাম বলে তুমি অশ্লীল নির্লজ্জ ও বেতমিজির উক্তি ও আচরণ পরিহার করো। কিন্তু আমরা তা পারছি কি? আমাদের সমাজে এ দোষ ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। অশ্লীল বই পুস্তক, ম্যাগাজিন ও পত্র পত্রিকায় দেশ ছেয়ে গেছে। সমাজের বিপুল সংখ্যক তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী, ছাত্র-ছাত্রী ও বিশেষ এক শ্রেণীর মধ্যে নির্লজ্জতা ও বেআদবী মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। অশ্লীল কথা বলা ও নির্লজ্জভাবে চলাফেরা করা আজকাল একটা মস্তবড় বাহাদুরীতে পরিণত হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের নির্দেশ, তোমরা অমিতব্যয় ও অতিরিক্ত বিলাসব্যসন পরিত্যাগ করো। কিন্তু আমরা কি এ নির্দেশ মানি? মানি না। সুযোগ সুবিধা পেলে আমরা বাহুল্য খরচ, বিলাসব্যসন ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবনে মশগুল হয়ে পড়ি। সমাজের ধনিক শ্রেণীর অনেকেই আজ আসল কর্তব্য ভুলে বিলাসিতার স্রোতে ভেসে চলেছেন। এসব দেখে শুনে নজরুল দুঃখের সাথে বলেছেন ঃ

নহি মোর জীব ভোগ বিলাসের
শাহাদত ছিল কাম্য মোদের,
ভিখারীর সাজে খলীফা যাদের
শাসন করিল আধা জাহান,
তারা আজ পড়ে ঘুমায়ে বেহুশ
বাহিরে বহিছে ঝড় তুফান।

ইসলাম বলে তুমি পবিত্র কুরআনের পঠন পাঠনের কাজে আত্মনিয়োগ কর। আমরা কি এ নির্দেশ মেনে চলছি? না–কখনই না। অধিকাংশ মুসলমান কুরআনের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করাতো দূরের কথা, কুরআনের 'রিডিং' পড়তেই জানে না। সমাজের অধিক সংখ্যক তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী, ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তি আজেবাজে পুস্তক ও জঘন্য ধরনের

www.draminlibrary.com

মাসিক ও সাময়িক পত্র পত্রিকা পড়ে সময় নষ্ট করছে, অথচ যে পবিত্র কুরআনের ব্যক্তিগত চরিত্র সংশোধনের উপদেশ রয়েছে; যে পবিত্র কুরআনে আল্লাহর ইবাদত সংক্রান্ত আদেশ নিষেধ রয়েছে; যে পবিত্র কুরআনে মানুষের জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত যাবতীয় প্রয়োজনের কথা রয়েছে; যে পবিত্র কুরআনে মানুষের মৃত্যুর পর তার আত্মার শান্তি ও কল্যাণ সাধনের জন্য যা কিছু দরকার সবই রয়েছে; যে পবিত্র কুরআনে দীন ও দুনিয়া, দেওয়ানী ও ফৌজদারী, দৈনন্দিন জীবন ও শাসনতান্ত্রিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন ও ব্যবহারিক জীবনের যাবতীয় আদেশ নিষেধ রয়েছে ঃ সেই পবিত্র কুরআন তারা পড়ে না, তার দিকে একটু ফিরেও তাকায় না। তাই কবি মর্মাহত হয়ে বলেন ঃ

কুরআন হাদীস রহিল পড়িয়া দৃষ্টি দিলে না তায়,
নকল লইয়া টানাটানি কর মুসলিম তুমি হায়।
খোদার কালামে ঠেলিয়া সকলে নকল মুসলমান,
নকল হৃদয়ে নকল রচিয়া কর তার সম্মান।

বলাবাহুল্য এই পবিত্র কুরআনের পঠন পাঠন ও গবেষণা ছেড়ে দিয়েই আজ আমরা অধঃপতিত ও লাঞ্ছিত।

পবিত্র কুরআনের নির্দেশ, মাতা-পিতার সহিত সদ্ব্যবহার কর, তাঁদেরকে কর্কশ কথা বলো না, তাঁদের উপর রাগান্বিত হয়ো না। কিন্তু এ নির্দেশও আজ আমাদের কাছে উপেক্ষিত। ছেলেমেয়েরা আজ বাবা-মার কন্ট্রোলের বাইরে। ছেলেরা মায়ের কথা শুনে না, বাপের কথা মানে না। কত যে পুত্র প্রচুর অর্থ উপার্জন করে শহরে বন্দরে আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে সুখে দিন কাটায়, আর তার মাতা-পিতারা মফস্বলের পর্ণকুটীরে খাওয়া পরা ও চিকিৎসার অভাবে দুঃসহ যাতনা ভোগ করে কে তার হিসাব করবে।

ইসলাম বলে দুঃস্থ, পীড়িত ও আর্তমানবের সেবা কর। কিন্তু আমরা তা করি না। কেউ কারো দুঃখ বুঝি না। যে কষ্ট পাচ্ছে পাক, "নিজে বাঁচলে বাপ-দাদার নাম" এই হচ্ছে আমাদের কথা।

ইসলামের নির্দেশ, দু'জন বা দু'দল লোক বিবাদে লিপ্ত হলে আপোষ করে দাও। আমরা কিন্তু বেশী করে বিবাদ লাগিয়ে দেওয়ার তালে থাকি। বিবাদ লাগিয়ে দিয়ে, মামলা মোকদ্দমা বাধিয়ে দিয়ে সর্বনাশ সাধনের চেষ্টা করি। মুসলিম প্রধান দেশের তো কোন কথাই নেই; হিন্দু প্রধান ভারত রাষ্ট্রের আদালতসমূহে দেখা গেছে অধিকাংশ মামলা মুসলমানের। একমাত্র কারণ আগুন জ্বলে উঠলে তামাসা দেখতে আমরা ভালবাসি, আগুন নিভাবার কেউ চেষ্টা করি না।

www.draminlibrary.com

ইসলামের নির্দেশ, তুমি ন্যায়ের আদেশ কর ও অন্যায়ের প্রতিবাদ কর। আমরা কিন্তু এ আদেশও মানি না। বিভিন্ন ধরনের অন্যায় কাজের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন আমরা যুগিয়েই থাকি। নিজেদের স্বার্থে অন্ধ হয়ে আমরা ন্যায়কে ন্যায় ও অন্যায়কে অন্যায় মনে করি না। যদি মুসলমান ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করতো তা'হলে এতো অন্যায় সমাজে কখনই থাকতো না।

কুরআন বলে, তোমরা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়োনা। কিন্তু বর্তমানে ব্যভিচার মুসলিম সমাজে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী ও বিশেষ এক শ্রেণীর মধ্যে অবাধ যৌন-মিলন চরমে পৌঁছে গেছে। আর এই যৌননৈতিকতার পথকে প্রশস্ত করে দিচ্ছে মেয়েদের পূর্ণ স্বাধীনতা আর গর্ভনিরোধ ও গর্ভ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র ও বটিকা।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ, যারা ইসলামের শত্রু, যারা মুসলমানের শত্রু, ইসলামকে যারা তিলে তিলে নিশ্চিহ্ন করতে চায়, লেখনীর মাধ্যমে, পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমে ও বিভিন্ন কলা কৌশল অবলম্বন করে যারা ইসলামের গৌরব ও মহিমাকে নষ্ট করতে চায়–তাদের সহিত অন্তরঙ্গতা, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্ব পরিহার কর। কিন্তু আমরা তা করি কি? করি না। দুনিয়ার স্বার্থে আমরা ইসলামের শত্রুকে শত্রু মনে করি না। আমরা অনেকে চাই মুসলমানের সর্বনাশ হয় হোক, ইসলাম উচ্ছন্নে যায় যাক, আমার স্বার্থ ষোল কলায় যেন পূর্ণ হয়। এ ধরনের মুসলমানকে কবি শ্লেষের সুরে বলেছেন–

ইসলামে তুমি দিয়ে কবর
মুসলিম বলে করো ফখর
মুনাফিক তুমি সেরা বেদীন।
ইসলামে যারা করে জবেহ্
তুমি তাদেরই হও, তাবে–
তুমি জুতো বওয়া তারি অধীন।

ইসলামের নির্দেশ কোন স্থানে একাধিক লোক থাকলে একজন সর্দার নিযুক্ত করে জামাআতী শৃঙ্খলা রক্ষা কর। আমরা ইসলামের এ নীতিও মানি না। যেখানে একাধিক লোক থাকি সেখানেই আমাদের বিশৃঙ্খলা। জামাআতী শৃঙ্খলা বলতে মুসলিম সমাজে কিছু নেই। মুসলমান আজ কেউ কারো সর্দারী মানি না–নিজে নিজে সবাই মাতব্বর।

ইসলাম বলে, তুমি মওজুদ টাকার ও সোনার, ব্যবসায়ে নিয়োজিত মালের ও গবাদি পশুর যাকাত পরিশোধ কর আর উৎপন্ন শস্যের ওশর প্রদান কর। কুরআনে যেখানে নামায সম্পর্কে তাগিদ দেয়া হয়েছে, সেখানেই যাকাত সম্বন্ধে

www.draminlibrary.com

তাগিদ দেয়া হয়েছে। অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আজ মুসলমানদের কাছে উপেক্ষিত। সমাজের অধিকাংশ মালদার আজ কারুনের মত মাল জমা করেই চলেছেন। প্রত্যেকে যদি যাকাতের নির্ধারিত অংশ হিসাব নিকাশ করে দিতেন, তাহলে দারিদ্র বলে কোন জিনিস আজ থাকতো না। তাছাড়া এই যাকাতের অর্থ দিয়ে ইসলামিক মিশনও প্রতিষ্ঠিত হতো। খ্রীষ্টানেরা যেমন বার নদী তের সমুদ্র পারে এসে আমাদের বুকের মাঝে 'মিশন' তৈরী করে জোরে শোরে খ্রীষ্ট মতবাদ প্রচার করছে। ভারত সেবাশ্রম ও রামকৃষ্ণ মিশন যেমন হিন্দু মতবাদ প্রচার করছে। আমরাও ঠিক তেমনি শ্রেষ্ঠধর্ম ইসলামের গৌরব ও মহিমাকে দুনিয়াবাসীর সামনে তুলে ধরতে পারতাম, যদি আমাদের ধনিক শ্রেণী আল্লাহর নির্ধারিত অংশটুকু অকাতরে দিয়ে 'বায়তুল মাল' গঠন করতে পারতেন। কিন্তু না, এই গুরুত্বপূর্ণ ফরজ আদায় হচ্ছে না। অথচ দাবী আমাদের সকলের যে আমরা খাঁটি মুসলমান।

পবিত্র কুরআনের ঘোষণা, শক্তি সামর্থ্য যার আছে তার পক্ষে জীবনে একবার হাজ্জ করা ফরজ। আমার মনে হয়, যাঁদের শরীর স্বাস্থ্য ভাল আর আর্থিক সচ্ছলতাও আছে, তাঁদের শতকরা নব্বইজন এই ফরজ আদায় করেন না। তাঁদের কাছে যেন এই গুরুত্বপূর্ণ ফরজের কোন মূল্যই নেই।

প্রিয় রসূল (সঃ) বলেছেন, এরূপ ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি, যে ঋণের বোঝার চাপে ভয়ানক নিষ্পিষ্ট হচ্ছে; ঐ ভিক্ষুক যে দারিদ্র্য ও উপবাসের কঠোরতায় মাটিতে ঢলে পড়েছে; আর ঐ ব্যক্তি যে খুনের অপরাধে অপরাধী হয়ে খুনের ক্ষতিপূরণ দিতে পারছে না; এই তিন প্রকারের লোক ছাড়া অন্য কোন লোকের পক্ষে ভিক্ষা করা হালাল নয়। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে ভিক্ষা বৃত্তিটা একটা ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। আমার মনে হয় মুসলিম জাতির মধ্যে যত ভিক্ষুক, এত বিপুল সংখ্যক ব্যবসাদার ভিক্ষুক পৃথিবীর আর কোন জাতির মধ্যে নেই।

ইসলাম বলে তুমি পুঁজিবাদকে সমর্থন করো না। কেননা যারা পুঁজিবাদী তাদের পার্থিব বিলাস বিভব হয় জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তারা বিলাসিতার সুখ চরিতার্থ করার জন্য গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়। গগনস্পর্শী প্রাসাদমালা, অত্যুৎকৃষ্ট ফোয়ারা, সুরম্য উদ্যান, মনোরম হাম্মাম, সুদর্শন সওয়ারী, রূপবান সেবক সেবিকা, বিবিধ প্রকার খাদ্যের প্রাচুর্য আর পোষাক পরিচ্ছদের আড়ম্বর–এই হয় পুঁজিপতিদের লক্ষ্য। তাই ইসলাম পুঁজিবাদকে সমর্থন করে না। কিন্তু আমরা পুঁজিবাদকেই সবচেয়ে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছি। মুসলমান পুঁজিপতিদের বিলাস ও সম্ভোগের রকমারিত্ব দেখে চক্ষু ঝল্‌সে যায়। লক্ষ লক্ষ মানুষের অভাব অভিযোগের কথা চিন্তা করার অবসরই তাঁরা পান না।

www.draminlibrary.com

ইসলাম যেমন পুঁজিবাদকে সমর্থন করে না ঠিক তেমনি উঁচু নীচু থাকবে না–ভেঙ্গে চুরে সব সমান করে দিতে হবে এ নীতিকেও ইসলাম সমর্থন করে না। ইসলাম মানুষকে অর্থোপার্জনের স্বাধীনতা দিয়েছে এবং সে অর্থ জমা রেখে নিজের জন্য, নিজের পরিবারবর্গের জন্য, অভাবগ্রস্থ আত্মীয় ও অনাত্মীয়ের জন্য, পাড়াপ্রতিবেশীর জন্য, কাঙ্গাল, কাঙ্গালিনী, অনাথ, অনাথিনী, দুঃস্থ, রুগ্ন, পতিত, দলিত ও উৎপীড়িতের জন্য এবং বিভিন্ন জনকল্যাণ মূলক কাজে ব্যয় করার জন্য আদেশ করেছে। কিন্তু মুসলমান সমাজের লক্ষ লক্ষ নর-নারী আজ মানুষের অর্থোপার্জনের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে খর্ব করার আন্দোলন শুরু করেছে।

মিথ্যা ফতোয়ার সাহায্যে অর্থোপার্জন করা ইসলামে হারাম। আমরা কিন্তু নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের জন্য শরীয়তের বিধিনিষেধকে কত যে উল্টা পাল্টা করছি তার ইয়ত্তা নেই। কত জবরদস্ত আল্লামাকে দেখি কুরআন হাদীসের প্রকাশ্য দলিলের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়ে নিজেদের স্বার্থোদ্ধার করে চলেছেন। এ সব দেখে শুনেই কবি বলেছেন ঃ

হক্ কো না হক্ করদিয়া যব্
হাত আয়ে সও পঁচাস
দিল্‌মে উন্‌কে খওফে মহ্‌শার
কা পাতা লাগ্‌তা নেহী।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ, সুদ খেয়ো না, মদ খেয়ো না, জুয়া খেলা করো না, গান বাজনা ও খেল তামাসায় বিভোর থেকো না। কিন্তু সমাজ এসব নিষেধ মেনে চলছে কি? কখনো না। সুদ দেয়া আজ ব্যাপক হারে চলছে। মদ, জুয়া ও গান তামাসার আড্ডা আজ সর্বত্রই। বিভিন্ন ক্লাবে, হোস্টেলে, রেস্তোরাঁয়, প্রেক্ষাগৃহে, হাটে-ঘাটে, মাঠে, বনে-জঙ্গলে, মদ, জুয়া ও বিভিন্ন অপকর্মের গোপন ও প্রকাশ্য আড্ডাগুলো বেদুইন-বর্বর-অসভ্য-জাহিলী যুগকেও হার মানিয়ে দিয়েছে। মদ ও জুয়া যে সকল অনর্থের মূল–এই সাধারণ জ্ঞানটুকুও আমরা হারিয়ে ফেলেছি। দেশ ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ আসনগুলোয় যারা সমাসীন, তাঁরাও অনেকেই আজ মদ; জুয়া ও গান তামাসায় বিভোর। এর চেয়ে আর কলঙ্কের কথা কি হতে পারে? ইসলামে ঘুষের কারবার হারাম। আমরা কিন্তু ঘুষটাকে 'আউট ইনকাম' বানিয়ে নিয়েছি। জনৈক হাজী সাহেব তাঁর মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে আমাকে দাওয়াত দিয়েছিলেন। আমি কিন্তু কর্মব্যস্ত থাকার দরুণ তাঁর এ নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারিনি। হঠাৎ একদিন হাজী সাহেবের সঙ্গে বাজারে দেখা। আমি যেতে না পারায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন। আমি বললাম, নব-দম্পতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক–দু'আ করি হাজী সাহেব, কিছু মনে করবেন

www.draminlibrary.com

না–বড় কর্মব্যস্ত ছিলাম, তাই দাওয়াত রক্ষা করতে পারিনি। তা' জামাই কেমন হলো বলুন। তিনি বললেন, আল্লাহর মর্জি জামাই খুব ভাল পেয়েছি। শ'তিনেক টাকা বেতন পান বটে কিন্তু আপনাদের দু'আয় 'জামাই' এর আউট ইনকাম অনেক আছে। আমি বললাম, আউট ইনকামের বাজার সর্বত্রই যখন গরম তখন আপনার জামাইয়ের পকেটই বা ঠাণ্ডা থাকবে কেন? মোট কথা আজকের অফিস আদালতের একটা ঝাড়ুদার থেকে শুরু করে ছোট সাহেব, মেজো সাহেব, বড় সাহেব–এমন কি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও দেশের আইন পরিষদ পর্যন্ত যেখানে যার কাছে যাবেন–চাই টাকা। ঘুষ না দিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনাকে নিরাশ হতে হবে আর না হয় চরম দুর্ভোগ পোহাতে হবে।

ইসলামে চুরি ডাকাতি ও খুনখারাবী হারাম। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে এসব অপরাধ একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। খবরের কাগজে, থানা ও আদালতের ফাইলে আমরা চুরি ডাকাতির যে সব রিপোর্ট পাই সেগুলি দেশের সামগ্রিক চুরি ডাকাতির শতকরা পাঁচভাগ মাত্র। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে চুরি ডাকাতিতে মুসলিম সমাজ কতটা উন্নতি করেছে। আর খুন খারাবী ও মানুষ মারার ব্যাপারটা আজকাল বাচ্চাদের খেলার মতই হয়ে গেছে। এমন কোন দিন নেই যে, দশ বিশটা মানুষ মারা পড়ছে না। মুসলমানের রক্ত মুসলমানের জন্য আজ হালাল হয়ে গেছে। সাম্প্রতিককালে যে সব ঘটনা দেখলাম তাতে পাঠান মরলো তো সেই মুসলমানই মরলো, বি.ডি.আর মরলো তা সেই মুসলমানই মরলো, আওয়ামী লীগের লোক, মুসলিম লীগের লোক, জামাআতের লোক, নিজামে ইসলামের লোক, পি.ডি.পি'র লোক, জমঈয়তে উলামার লোক, ন্যাপের লোক, জাতীয় লীগের লোক, শান্তি কমিটির লোক, আল্‌বদর ও আল্‌শামসের লোক ও মুক্তি বাহিনীর লোক, যখন যে মরলো মুসলমানই মরলো আর মুসলমানই মারলো। আজ রক্ত নিয়ে হলি খেলা চলছে। একটা জাতীয় জীবনে এর চেয়ে আর বড় অভিশাপ কি হতে পারে? যে জাতি কুত্তার মত মারামারি করে নিজেরা ধ্বংস হয়, পৃথিবীর কোন সভ্য জাতি তাদেরকে শ্রেষ্ঠ ও ভদ্র বলে অভিহিত করতে পারে কি?

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ, তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করো না, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না, কর্কশ ও উচ্চ কণ্ঠে কথা বলো না, উদ্ধতভাবে চলাফেরা করো না। কিন্তু মুসলমান বিশ্বাসঘাতকতায় রেকর্ড স্থাপন করেছে। ইমাম হোসেনের প্রতি কুফাবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতা আর বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাবের সহিত মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা ইতিহাসে রেকর্ড হয়ে আছে। কুফাবাসীরা আজ নেই, মীরজাফরও নেই কিন্তু তাদের হাজার হাজার জারজ সন্তান সমাজে বিদ্যমান, আজও তাদের কাজ চলতেই আছে আর চলতে

www.draminlibrary.com

থাকবে। তারপর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কথা, এটা যেন আমাদের একটা ব্যবসাদারীতে পরিণত হয়েছে। সাধারণ পর্যায়ের কথা ছেড়েই দিলাম। কত রাজনীতি বিশারদকে রাজনৈতিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে–

হিঁয়া করেঙ্গা হুঁয়া করেঙ্গা

লাঠিকে আন্‌দর মুগুর ভরেঙ্গা– ব'লে কত প্রতিশ্রুতি দিতে শুনলাম। শেষে কার্যক্ষেত্রে দেখলাম সবই শূন্য গর্ভ আস্ফালন। কর্কশ ও উচ্চকণ্ঠে কথা বলা আর উদ্ধতভাবে চলাফেরা করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হলেও–এ যেন আমাদের এক শ্রেণীর ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে।

ইসলাম বলে, পশ্চিমী সভ্যতার অনুকরণে অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় থেকো না আর নরনারীর অবাধ মেলামেশা বন্ধ করো। আমরা কিন্তু এই বিধিনিষেধের মূলেও কুঠারাঘাত হেনেছি। আমাদের ছাত্র-ছাত্রী, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী ও বিশেষ একশ্রেণী বলগাহীন স্বাধীনতা পেয়ে চরমে পৌঁছে গেছে। তারা অর্দ্ধনগ্ন ও অশোভন পোষাক পরিধান করে, তাদের চালচলন ও অঙ্গ ভঙ্গিমায় ফুটে উঠে চরম নির্লজ্জতার ছাপ। তারা এক সাথে উপবেশন করে, নিঃসঙ্কোচে আলাপ আলোচনা করে, এক সাথে যৌন শিক্ষার তা'লিম নেয়, আমাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে অসংযম নাচগানের সুযোগ পায়, একসাথে তারা সিনেমা থিয়েটার দেখে, একসাথে তারা সুদূর উন্মুক্ত প্রান্তরে অথবা বৃক্ষবাগের মায়াময় নির্জন পরিবেশে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা লাভের উদ্দেশ্যে প্রমোদ ভ্রমণে যায়, তারা সিনেমা ও প্রেক্ষাগৃহের আরাম কেদারায় একত্রে একাসনে বসে যৌন আবেদন পূর্ণ দৃশ্য দেখে। এসব তাদের একটা নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেছে। এসবের পরিণতি যা ঘটছে, আশা করি তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

ইসলাম বলে, বিনা প্রমাণে কারো সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করো না, অজ্ঞাত বিষয়ে মতামত পোষণ করো না, কোন ব্যক্তির নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে কোন মানুষের দোষ অন্বেষণ করো না, অধিক ঠাট্টা তামাসা করো না, গুজব-চঞ্চল হয়ো না, কৃপণ হয়ো না, সকল প্রকার সৎকর্ম ও সাহায্যের জন্য এগিয়ে চলো আর মহাবিচারের দিনে বিশ্বাস স্থাপন কর। এ ধরনের বহু আদেশ নিষেধ ইসলামে রয়েছে। কিন্তু আমরা মুসলমান বলে দাবী করছি অথচ এসব আদেশ নিষেধ মানছি না। যদি কেউ একটা নীতি মানিতো দশটা নীতিকে উপেক্ষা করে চলি।

পবিত্র কুরআনের ঘোষণা, ইয়া আইউহাল্লাযীনা আমানুদ্ খুলু ফিস্‌সিল্‌মে কাফ্ ফাহ্। হে ঈমানের দাবীদারগণ, তোমরা জাতিতে মুসলমান, পরিবেশে হিন্দু ও শিক্ষায় খ্রীষ্টান হয়ে আমলকে কলঙ্কিত করো না। তোমরা জাতিতে মুসলমান, পরিবেশে মুসলমান, শিক্ষায় মুসলমান ও আমলে মুসলমান হও, অর্থাৎ পূর্ণ

www.draminlibrary.com

মুসলমান হও। কুরআনের এই নির্দেশও আমাদের কাছে একে বারে উপেক্ষিত। তাই বলছিলাম, যে জাতির মধ্যে একতা নেই, যে জাতি হিন্দু ও খ্রীষ্টানের অনুকরণ প্রিয়, যে জাতি সুযোগ সুবিধে পেয়ে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও আদর্শকে রক্ষা করার কোন উপযুক্ত ব্যবস্থাই নিতে পারেনি, যে জাতি পরিবেশে হিন্দু, শিক্ষায় খ্রীষ্টান ও জাতিতে মুসলমান, যে জাতি মসজিদেও যায় না, মন্দিরেও যায় না, গীর্জাতেও যায় না, যে জাতি কুরআনও পড়ে না, বেদও পড়ে না, বাইবেলও পড়ে না, যে জাতি সর্বব্যাধিতে আজ জর্জরিত, যে জাতি অধঃপতনের অতল তলে আজ হাবুডুবু খাচ্ছে, তাদেরকে 'লর্ড বার্নাডশ' নিকৃষ্ট বলবেন না তো কোন্ ভাষায় অভিহিত করবেন?

কিন্তু এই কি আমাদের সঠিক পরিচয়? যে জাতি সারা দুনিয়াকে সভ্যতা শিখিয়েছে তার কি এই পরিচয়? তাই বলি ঃ

যে মুসলিম জাতি বিশ্বজগত করেছিল স্তম্ভিত
হারাইয়া গতি পথে বসে কেন আজ তারা হতভম্ভিত?
নব সভ্যতা এনেছিল যারা অসভ্য তারাই আজ
তাদের আচার ব্যবহারে হায় ইহুদীও পায় লাজ।
অন্যেরে জ্ঞান বিলাইল যারা আজ তারা অজ্ঞান,
বিশ্বের জ্ঞান মহফিলে আর নাই যে এদের স্থান।
জামানার পটে এ চলচ্চিত্রে গতিহীন তস্‌বীর
অভিশাপ আর জিল্লতে ভরা সে বুলন্দ তক্‌দীর।
অগ্রে দৃষ্টি চলেনাতো আর শুধু চায় পশ্চাতে,
তাহাও দেখিতে পায় না স্পষ্ট সে ক্ষীণ দৃষ্টিপাতে।
অপর জাতির রকেট যখন চাঁদের পানেতে ধায়,
সেই যুগে এরা রয়েছে মত্ত চাঁদ দেখা ফতোয়ায়।
আর কিরে হায় এই তস্‌বীর পাইবে না আলো প্রাণ?
যুগের ফিল্মে চলচ্চিত্রের লভিবে না আর স্থান?

পরিশেষে সেই দয়ার দরিয়া-দরবারে ইলাহির হুজুরে প্রার্থনা জানাই, হে আল্লাহ! তুমি এই মুসলিম জাতিকে অধঃপতনের অতল সলিল হতে উদ্ধার করে গৌরবের হিমাদ্রি শিখরে বসাও। প্রভু হে, তুমি আমার প্রার্থনা কবুল কর।

সমাপ্ত